ফুলবাড়ীর গল্প

আনু মুহাম্মদ

আমার ইচ্ছা ছিলো ফুলবাড়ী প্রতিরোধের এক দশকের একটি সারসংকলন করার। এই একদশক ধরে বিজয়ের ওপর দাঁড়িয়ে জনগণের প্রতিরোধ জারি থাকার পেছনে অসংখ্য মানুষের অবদান আছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছেন প্রকল্প এলাকার মানুষ। এর পাশাপাশি এর সপক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন মানুষের শ্রম, অসংখ্য ঘটনা, একের পর এক চক্রান্ত মোকাবিলা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মাঠের অবিরাম লড়াই সবই গুরুত্বপূর্ণ। এসবের সবই পর্যালোচনায় আনার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সংক্ষেপে লিখলেও প্রথম বছরের ঘটনাবলীই সর্বজনকথা নির্ধারিত জায়গা অতিক্রম করে গেলো। সুতরাং বাকি অনেকটা পরে কখনো লেখার জন্য রেখে দিতে হলো।

'ভোট দিয়া সরকার মেম্বর বানাই আমরা, আর তাদের কাছে আমাদের চাইতে কোম্পানির দাম বেশি?'[১]

'এসব সরকার তো আসে আর যায়। এরা অস্থায়ী, আমরা জনগণই স্থায়ী সরকার।'[২]

ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প : চুক্তি হলো কিভাবে? কী ছিল চুক্তিতে?

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কয়লা কোম্পানি অস্ট্রেলিয়ার বিএইচপির সাথে বাংলাদেশ সরকার দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে কয়লা সম্পদ অনুসন্ধানের লাইসেন্স সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে ১৯৯৪ সালের ২০ আগস্ট। একপর্যায়ে ফুলবাড়ীতে সমৃদ্ধ কয়লাখনির অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হয়। ১৯৯৭ সালে রহস্যজনকভাবে রাতারাতি এশিয়া এনার্জি নামের একটি কোম্পানির জন্ম হয়। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নতুন এই কোম্পানির হাতে বিএইচপি তার লাইসেন্স হস্তান্তর করে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ নিয়ে অন্যান্য চুক্তির মতো এটিও ছিল গোপন। জনগণের খনিজ সম্পদ, জীবন-জীবিকা, আবাদি জমি, পানি সম্পদ যে প্রকল্পের আওতাভুক্ত সেই প্রকল্প সম্পর্কে জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়। প্রশ্ন হলো, কেন এ রকম সমৃদ্ধ খনির অস্তিত্ব জানার পর বিএইচপি বড় ব্যবসার সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করল? দ্বিতীয়ত, কারা ঠিক ঐ সময়ই ফুলবাড়ী কয়লাখনি লক্ষ্য করে একটি নতুন কোম্পানি খুলল? আর তৃতীয়ত, কেন বিএইচপি তার হাতেই নিজের লাইসেন্স হস্তান্তর করল? সরকারই বা কেন এটা অনুমোদন করল?

প্রথম প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি ভূতত্ত্ববিদ নজরুল ইসলামের কাছ থেকে, যিনি বিএইচপির কনসালট্যান্ট জিওলজিস্ট হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। বাংলাদেশে এই কোম্পানির আসার ব্যাপারে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছিলেন। ২০০৮ সালের জুন মাসে সিডনিতে তাঁর সাথে আমার দেখা হলে তিনি এসব বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার করেন। পরে তিনি এ নিয়ে লিখেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো, উন্মুক্ত খনি বিএইচপির জন্য নিশ্চয়ই অনেক লাভজনক হতো। কিন্তু তার জন্য যে গভীরতায় কয়লাস্তর থাকা দরকার ফুলবাড়ীর কয়লা তার চেয়ে অনেক গভীরে, ১৫০ থেকে ২৬০ মিটার। বিএইচপি খুব ভালো করেই জানত, এ রকম গভীরতায় উন্মুক্ত খনি করতে গেলে ভূতাত্ত্বিক ও কারিগরি সমস্যা মোকাবিলা ছাড়াও বহুমাত্রিক দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অসংখ্য নদীনালা, খালবিল, মৌসুমি ভারি বৃষ্টি, বন্যাপ্রবণ এই অঞ্চলে অস্ট্রেলীয় মান তো দূরের কথা, যেকোনো দেশের বিধি রক্ষা করে উন্মুক্ত খনি পরিচালনা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া বিএইচপি চায়নি পাপুয়া নিউ গিনির ওক-টেডি কপার খনির মতো আরেকটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের দায় নিতে, যেখানে খনির বিষাক্ত পানি নিকটবর্তী নদীতে ভযাবহ দূষণের সৃষ্টি করেছিল এবং নিচের বিশাল অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিএইচপিকে অল্পদিন পরই প্রকল্প বাতিল করে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের পানির আধার ও অন্য সবকিছু মিলে পরিস্থিতি আরো অনেক জটিল। বিএইচপি তাই বুঝেশুনে আগেভাগেই বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিল। (নিউ এইজ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮; ডেইলি স্টার, ৩০ মে ২০১০)

বিএইচপির মতো অভিজ্ঞ সংস্থা যা সাহস করেনি তা করার কথা বলে নতুন একটি কোম্পানি লাইসেন্স পেয়ে গেল, পরিবেশগত সমীক্ষা করার আগেই তারা ছাড়পত্রও পেল![৩]

পুরো প্রকল্প তাই প্রথম থেকেই অনিয়ম আর দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। ২০০৬ সালে সরকার গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটিও অনেকগুলো অনিয়মই শনাক্ত করেছে। আমাদের জানা অনিয়ম আর বেআইনি তৎপরতার মধ্যে আছে :

১.এশিয়া এনার্জির সঙ্গে চুক্তিতে রয়্যালটি দেখানো হয়েছে ৬ শতাংশ। কিন্তু বিএইচপির সঙ্গে চুক্তির যে সূত্র ধরে এই চুক্তি করা হয়েছে সে সময় রয়্যালটি ছিল ২০ শতাংশ।

২. এশিয়া এনার্জির কাছে বিএইচপির হস্তান্তর ঘটে ১৯৯৮ সালে, কিন্তু তা তখন গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বৈধ করা হয়নি।

৩. এশিয়া এনার্জি সরকারের কাছে যে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান জমা দিয়েছে তার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে ৩ শতাংশ ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়া। এই ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া কোনো দলিলই গ্রহণ করার কথা নয়। বাংলাদেশ সরকারের কাছে এশিয়া এনার্জি কোনো ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয়নি, যার পরিমাণ প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। সুতরাং তার দলিলপত্র পুরোটাই অবৈধ।

৪. প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ জমি উন্মুক্ত খনির জন্য দেওয়া যায় তার ১০ গুণেরও বেশি জমি এশিয়া এনার্জিকে দেওয়া হয়েছিল খনির জন্য।

৫. বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে, যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গেলে সেই এলাকার মানুষদের সম্মতি লাগবে। ফুলবাড়ী এলাকার মানুষের সম্মতি আছে–এই মর্মে দেশে ও বিদেশে মিথ্যাচার করেছে এশিয়া এনার্জি।

৬. জাতিসংঘের কনভেনশনে আছে, যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্পের এলাকায় যদি আদিবাসী জনগোষ্ঠী থাকে তাহলে তার পূর্ণ সম্মতি নিতে হবে। ফুলবাড়ী প্রকল্প এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এই প্রকল্প দাঁড় করানো হয়েছিল।

৭. এশিয়া এনার্জি 'বিনিয়োগের টাকা' দিয়ে জনগণের মধ্যে দুর্নীতি ছড়ানোর চেষ্টা করছিল। রঙিন টেলিভিশন বিতরণ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে তারা ঘুষ বিতরণের চেষ্টা করেছিল, ইনফর্মার নিয়োগ করেছিল, সন্ত্রাসী তৈরি করছিল।

৮. চূড়ান্ত ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার আগেই এশিয়া এনার্জি তার ওয়েবসাইটে ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প দেখিয়ে শেয়ারবাজারে প্রতারণা করেছে। ওয়েবসাইটে এই প্রকল্প প্রাপ্তির, এই ক্ষেত্রে সরকারের 'পজিটিভ' ভূমিকার কথা বলে, বড় বড় তথ্য দিয়ে, ওয়ার্ক অর্ডার নিশ্চিত–এ রকম ধারণা দিয়ে কোম্পানি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার খুঁটি তৈরি করেছে, লন্ডন শেয়ার মার্কেটে তার শেয়ারের দরও বেড়েছে। পুঁজিবাজার থেকে তুলেছে আরো বেশি বেশি পুঁজি। ২৫ আগস্ট পর্যন্ত এই শেয়ারের দাম প্রায় ৯০০-তে উঠেছিল। ২৬ আগস্টের পর থেকে এটা কমতে থাকে এবং তা প্রায় ১০০-তে নেমে আসে। ফুলবাড়ী চুক্তি সম্পাদনের পরই কেবল কোম্পানি সব লেনদেন বন্ধ করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়।

এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ সৃষ্টি হয় তিনটি কারণে। প্রথমত, উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি, যেটি স্পষ্টতই ফসলের ভাণ্ডার এই অঞ্চলে তিনফসলি আবাদি জমি নষ্ট করবে, ছয় থানাসহ উত্তরবঙ্গের ভূগর্ভস্ত পানির স্তর অনেক নিচে নামিয়ে মরুকরণ সৃষ্টি করবে, পানি দূষণ করে সারা দেশের পানি সম্পদ বিপর্যস্ত করবে এবং সর্বোপরি যাতে খনি এলাকা ও খনি এলাকার বাইরে লাখো মানুষ উচ্ছেদ হবে। আরো লাখো মানুষ জীবিকা হারাবে। দ্বিতীয়ত, মালিকানা–যাতে পুরো কয়লাখনির মালিকানা পেতে যাচ্ছিল এশিয়া এনার্জি। বাংলাদেশের ভাগে ছিল শুধুমাত্র ৬ শতাংশ রয়্যালটি, যার মধ্যে আবার কয়লা বিদেশে রপ্তানির জন্য রেললাইনসহ অবকাঠামো নির্মাণের খরচও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং তৃতীয়ত, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন না মিটিয়ে কয়লা সম্পদ বিদেশে রপ্তানি। সেই রপ্তানির আয়ও বাংলাদেশ নয়, মালিকানা অনুযায়ী সেটা পেত এশিয়া এনার্জি। রপ্তানি থেকে তাদের আয় এমনকি দেশের ভেতরে ব্যাংকেও আসবে না, সেভাবেই চুক্তি করা হয়েছিল। আবাদি জমি, মাটির ওপরের ও নিচের পানি সম্পদ, বসতভিটা–সবকিছু ধ্বংস করে লাখ লাখ মানুষকে উদ্বাস্তু করে, উত্তরবঙ্গকে অনুর্বর বিরানভূমিতে পরিণত করে, দেশের কয়লা সম্পদ দ্রুত বিদেশে পাচারের এ প্রকল্পই 'উন্নয়ন' নামে চালু করার চেষ্টা হয়েছিল। পুরো প্রকল্পটি ছিল তাই জ্বালানি নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ এ রকম একটি প্রকল্প ঠেকিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে।

আবাদি জমি, মাটির ওপরের ও নিচের পানি সম্পদ, বসতভিটা–সবকিছু ধ্বংস করে লাখ লাখ মানুষকে উদ্বাস্তু করে, উত্তরবঙ্গকে অনুর্বর বিরানভূমিতে পরিণত করে, দেশের কয়লা সম্পদ দ্রুত বিদেশে পাচারের এ প্রকল্পই 'উন্নয়ন' নামে চালু করার চেষ্টা হয়েছিল। পুরো প্রকল্পটি ছিল তাই জ্বালানি নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ এ রকম একটি প্রকল্প ঠেকিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে।

আন্দোলনের মূল দাবি ক্রমে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তিনটি স্লোগানে : 'উন্মুক্ত না, বিদেশি না, রপ্তানি না'। এই তিনটি 'না'র মধ্যে আসলে প্রকাশিত হয়েছিল জনগণের স্বার্থের 'হ্যাঁ' : বাংলাদেশের সম্পদ জনগণের কর্তৃত্বে ও মালিকানায় বাংলাদেশেই থাকবে; বিদেশি কোম্পানি বা কোনো গোষ্ঠীর মুনাফার জন্য নয়, জনগণের প্রয়োজনেই কেবল সম্পদ ব্যবহার করা যাবে। এই আন্দোলন অতএব শুধু ফুলবাড়ীসহ ছয় থানার মানুষের জমি-বসত রক্ষার আন্দোলন নয়; এটি দেশের সম্পদ রক্ষার আন্দোলন, জনগণের সম্পদের ওপর জনগণের কর্তৃত্ব রক্ষার আন্দোলন। এই আন্দোলন একই সঙ্গে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি ও তার দেশীয় সহযোগীদের মুনাফার স্বার্থে দেশের সম্পদ দখল ও মানুষকে উদ্বাস্তু বানানোর সাথে সাথে পানি সম্পদ, আবাদি জমি, প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধের ঐতিহাসিক চিহ্ন। এই আন্দোলন মানুষ ও প্রকৃতিকে কেন্দ্রে রেখে নতুন উন্নয়ন দর্শন হাজির করার আন্দোলন।

জনপ্রতিরোধের কেন্দ্রীয় এই সুর এবং তার ব্যাপ্তির কারণে এটি দ্রুত সে সময় দেশের সকল শ্রেণি, পেশা ও স্তরের মানুষের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। নিজেদের ভিত্তি তৈরি করতে গিয়ে এশিয়া এনার্জি অঞ্চলে মিথ্যাচার, দুর্নীতির বিস্তার, দালাল তৈরির অপচেষ্টা শুরু করে। তাদের অপচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে জনগণ আরো শক্তিশালী প্রতিরোধে শামিল হয়। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২৬ আগস্ট ২০০৬। গুলি ও নির্যাতন করে, অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জনগণকে থামানো যায়নি। গণ-অভ্যুত্থান দ্রুত ছয় থানা অতিক্রম করেছিল। সারা দেশে প্রতিরোধ বিক্ষোভ বিস্তার লাভ করছিল, দেশব্যাপী হরতালও পালিত হয়েছিল। অবশেষে ৩০ আগস্ট সরকার আন্দোলনকারীদের সকল দাবি মেনে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

তার পরও গত ১০ বছরে বিভিন্ন সরকারের আমলে (বিএনপি-জামায়াত চারদলীয় জোট, সামরিক বাহিনী পরিচালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আওয়ামী লীগ সরকার) বারবার এই প্রকল্প চালু করার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু অবিরাম প্রতিরোধে তারা বারবারই পরাজিত হয়েছে। ১০ বছর ধরে জাগ্রত এই প্রতিরোধের মূল শক্তি স্থানীয় জনগণ ও সংগঠন। এর পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিরোধও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই ১০ বছরের প্রতিরোধগাথা এক বিশাল অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা। এই লেখায় শুধুমাত্র ২০০৬ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পূর্বাপর অভিজ্ঞতার একটি সারসংকলন করা হয়েছে।

কিভাবে শুরু হলো ফুলবাড়ী প্রতিরোধ?

ফুলবাড়ীসহ চার থানার মানুষ ২০০৪ সাল থেকে তাদের এলাকায় কোম্পানির তৎপরতা দেখতে শুরু করে। ২০০৫-এর প্রথম থেকেই কোম্পানির ভিডিও, প্রকাশনাসহ নানা রঙিন প্রচার দিয়ে ফুলবাড়ী, বিরামপুর, পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ থানার শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মানুষের সম্মতি আদায় করতে চেষ্টা চলে। কিন্তু এসব চকচকে প্রচার মানুষকে যতটা মুগ্ধ করে, তার চেয়ে বেশি প্রশ্নের মুখোমুখি করে। কোম্পানির বক্তব্য ও তৎপরতার মধ্যেই ছিল অনেক অসংগতি। সে কারণেই ফুলবাড়ীতে ক্রমে অবিশ্বাস ও ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

কমিউনিটি কাউন্সিল নামে কিছু তৎপরতার পর ২০০৫এর ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ 'ফুলবাড়ী শহর রক্ষা কমিটি' নামে প্রকাশিত হয়। এশিয়া এনার্জির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনাও হয় কমিটির। সংগঠকদের উত্থাপিত প্রশ্নের মুখে কাবু হয়ে পড়ে কোম্পানি। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মানুষকে যুক্ত করে কমিটির নাম হয় 'ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি'। ১৮ জুন কমিটির উদ্যোগে পার্বতীপুর, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ ও ফুলবাড়ীর মানুষ মিছিল করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয়। জুলাই মাসে প্রতীক অনশন হয়। এরপর সম্মিলিত কর্মসূচি ছাড়াও আদিবাসী সংগঠনগুলোর আহ্বানে আদিবাসী সমাবেশ, জুমার নামাজ থেকে মিছিল, হিন্দু সম্প্রদায়ের মিছিল, নারীসমাজের ঝাড়ু মিছিল, ফুলবাড়ীতে অর্ধদিবস হরতালসহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

২০০৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকার সিপিবি অফিসে জাতীয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সে সময় ফুলবাড়ী থেকে কয়েকজন মানুষ আমাদের সাথে কথা বলতে সেখানে হাজির হন। তাঁরা আমাদের এ খবরই জানাতে এসেছিলেন যে ফুলবাড়ীতে একটি কয়লাখনি প্রকল্প হচ্ছে। তাতে ঐ অঞ্চলের মানুষ উচ্ছেদ হবে এবং ক্ষতি হবে বহু রকম। এ বিষয়ে প্রতিরোধ তৈরি করতে তাঁরা ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি করেছেন। এই কমিটি ছিল সর্বদলীয়, এলাকার সব রাজনৈতিক দলের লোকজনই ছিলেন সেখানে: আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, গণফ্রন্ট, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি। এ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ছাত্র-শ্রমিক-ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনও এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরো ছিলেন দলবহির্ভূত ব্যক্তিবর্গ। সে সময় ক্ষমতায় ছিল বিএনপি-জামায়াতের চারদলীয় জোট। বৃহৎ বিরোধী দল আওয়ামী লীগ।

> 'উন্মুক্ত না, বিদেশি না, রপ্তানি না'। এই তিনটি 'না'র মধ্যে আসলে প্রকাশিত হয়েছিল জনগণের স্বার্থের 'হ্যাঁ' : বাংলাদেশের সম্পদ জনগণের কর্তৃত্বে ও মালিকানায় বাংলাদেশেই থাকবে; বিদেশি কোম্পানি বা কোনো গোষ্ঠীর মুনাফার জন্য নয়, জনগণের প্রয়োজনেই কেবল সম্পদ ব্যবহার করা যাবে।

আমাদের প্রশ্ন ছিল, এইসব দলের লোকজন যে কমিটিতে আছেন, সেখানে নিশ্চয়ই তাঁদের দাবি পূরণ হবে। আমাদের সাথে যোগাযোগ কেন? আমাদের কী করার আছে? প্রতিনিধিরা যা বললেন তার সারকথা হলো, 'এসব দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলন নিয়ে বিরক্ত, তাঁরা বলছেন কয়লাখনি হলে এলাকার উন্নয়ন হবে, এতে বিদেশি বিনিয়োগ যুক্ত। এর বিরোধিতা সম্ভব নয়।' সে জন্যই তাঁরা আমাদের কাছে এসেছেন। তাঁরা জানেন এই কমিটির কথা, কয়েকটি সফল আন্দোলনের কথাও শুনেছেন। তাঁদের প্রকাশিত লিফলেট ও কাগজপত্র দেখলাম। এলাকায় সক্রিয় জাতীয় গণফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্রটি বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ দিয়েছে। এই কয়লাখনি হলে এলাকার তিনফসলি কৃষিজমি ধ্বংস হবে, তাতে কৃষি উৎপাদনে কত ক্ষতি হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে কত ক্ষতি হবে তার খুব সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই হিসাব।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের জন্য সহজ ছিল না। কেননা প্রথমত, উন্মুক্ত কয়লাখনি সম্পর্কে আমাদের কারো জানাশোনা ছিল না। দ্বিতীয়ত, কয়লাখনি-উন্নয়ন-শিল্পায়ন–এ রকম একটি ছক আমাদের কমিটিরও কারো কারো মাথায় ছিল। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজেদের অবস্থান নির্দিষ্ট করার আগে আমাদের পুরো বিষয়টি জানতে হবে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সম্পদ এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা নিয়ে আমি এর আগে অনুসন্ধান করেছি। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা দেখেছি। এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত লিখেছি ১৯৮১ সালে। বাংলাদেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে এই তৎপরতা শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। অন্য সব চুক্তির মতো কয়লা খাতের চুক্তি নিয়েও কঠোর গোপনীয়তা রাখা হয়েছিল। সুতরাং এই কয়লা প্রকল্প নিয়ে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। ফুলবাড়ীর মানুষজন কোম্পানি তৎপরতায় জেগে উঠেছিল, তাদের কারণেই আমরা খবর পেলাম। এরপর শুরু হলো আমাদের অনুসন্ধান। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা জানার পাশাপাশি সুনির্দিষ্টভাবে এই প্রকল্প, কোম্পানি ও চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করতে থাকলাম। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন অধিদপ্তরে খোঁজ করেও এ সংক্রান্ত সরকারের কোনো দলিলপত্র পাওয়া গেল না। শহীদুল্লাহ ভাইসহ গেলাম সরকারের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অফিসে। কয়লাখনি অনুসন্ধান এবং ফলাফল বিষয়ে এখানেই তথ্য পাওয়ার কথা। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। দেখলাম, এই জরিপ অধিদপ্তর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও খুবই অবহেলা আর আর্থিক টানাপড়েনের মধ্যে কাজ করতে হয় এই প্রতিষ্ঠানের লোকজনকে।

বাংলাদেশের একটি বৃহৎ কয়লাখনি নিয়ে চুক্তি হয়েছে, অথচ বেশ কয়েক দিন চেষ্টা করেও সরকারি কোনো পর্যালোচনা, অবস্থানপত্র বা নীতিমালা পাওয়া গেল না–এটা বিস্ময়করই বটে, তবে আমাদের অভিজ্ঞতায় এটা নতুন কিছু ছিল না। আমরা জানি, এভাবেই চলে এই রাষ্ট্র, সর্বজনের সম্পদ (common property) নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, চুক্তি করে; কিন্তু জনগণের কাছ থেকে সবকিছুই গোপন রাখে। মুখে বলে উন্নয়ন, কিন্তু তার বিস্তারিত জনগণকে জানাতে ভয় পায়! কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো এই প্রকল্প সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানতে হবে এবং আমাদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে হবে, এবং তা হতে হবে শিগগিরই। আমাদের হাতে তখন এশিয়া এনার্জির কাগজপত্র, মানুষকে উন্নয়ন বোঝানোর জন্য সুন্দর সুন্দর ছবি ভরা প্রচারপত্র, প্রকল্প বিষয়ে তাদের নানা চিনিমোড়ানো বক্তব্য ও তথ্য। এর বাইরে প্রকল্প এলাকা সম্পর্কে গণফ্রন্টের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের তৈরি করা তথ্যপত্র। এই তথ্যপত্র তৈরিতে মূল ভূমিকা রেখেছিলেন গণফ্রন্ট ও কৃষক ক্ষেতমজুর সংগঠনের ফুলবাড়ী নেতা আমিনুল ইসলাম বাবলু এবং একইদলের দিনাজপুরের তৎকালীন নেতা মোশাররফ হোসেন নান্নু।[৪] সেগুলো ধরেই আমরা অগ্রসর হলাম। বলা যায় লোকভোলানো কথা, অসংগতি সরিয়ে কোম্পানির কাগজপত্র এবং সংবাদপত্রে প্রদত্ত বক্তব্য থেকেই আমরা প্রকল্পের রূপ এবং তার পরবর্তী ৩০ বছরের চেহারা বের করতে চেষ্টা করলাম। কোম্পানির কাগজপত্র থেকেই পরিষ্কার একটি ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের প্রকল্প উন্মোচন করতে পারলাম। এর সঙ্গে ফুলবাড়ী থেকে পাওয়া স্থানীয় তথ্যাবলি নিলাম। এগুলো বিশ্লেষণ করেই লিখলাম 'ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প : কার লাভ কার ক্ষতি'।[৫] এর ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হলো অক্টোবর মাসে। সেখানে বিশেষজ্ঞরা ছিলেন, তাঁরাও এর সঙ্গে যোগ করলেন। আমাদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট হলো শক্তিশালী একটি ভিত্তির ওপর। আমরা নিশ্চিত হলাম যে এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রকল্প শুধু ফুলবাড়ী এবং তার সাথে যুক্ত চার থানায় ভয়াবহ ক্ষতি করবে না, এটি বাংলাদেশের

বর্তমান ও ভবিষ্যতকেও বিপর্যস্ত করবে; সুতরাং জনগণকে সাথে নিয়ে এটি প্রতিরোধ করাই আমাদের কর্তব্য। আমাদের তাই করণীয় ঠিক হলো, এ বিষয়ে জাতীয় কমিটি 'ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি'র সাথে যৌথভাবে কাজ করবে।

এই লেখা ও বক্তব্য নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে 'ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প: কার লাভ কার ক্ষতি' শিরোনামে জাতীয় কমিটি থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হলো। প্রকৃতপক্ষে সেটাই হয়ে দাঁড়াল পরবর্তী আন্দোলনের হ্যান্ডবুক। শহর থেকে গ্রামে গ্রামে এই পুস্তিকার প্রচারের মধ্য দিয়েই জাতীয় কমিটির সাথে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের চিন্তা ও লড়াইয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

প্রথম কয়েক মাস আমাদের প্রধান করণীয় দাঁড়াল জাতীয়ভাবে আলোচনা সভা, সমাবেশ, বিতর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই ভয়ংকর প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে জানানো। প্রচারিত তথ্য ও যুক্তির বিপরীতে প্রকৃত তথ্য ও যুক্তি হাজির করা, উন্নয়ন সম্পর্কে বিদ্যমান কঠিন বিশ্বাসকে নাড়া দিয়ে নতুন উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করা। সমাজে যেখানে 'উন্নয়ন' নামে শক্তিশালী আচ্ছন্নতা মানুষকে কোনো প্রশ্ন করতে দেয় না, মানুষ ও প্রকৃতির বিপন্নতা এমনকি জাতীয় স্বার্থ যেখানে তথাকথিত বিদেশি বিনিয়োগ, জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, যখন প্রকৃত লাভক্ষতির হিসাবের চেয়ে বিদ্যমান উন্নয়ন চিন্তায় লুণ্ঠন, আধিপত্য আর ধ্বংসকে চিনি দিয়ে মুড়ে মহিমান্বিত করা হয়, যেখানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদসহ বিশেষজ্ঞরা এসবের সুবিধাভোগী এবং অন্ধ প্রচারক, সেখানে এ রকম প্রকল্প সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক/বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই খুব কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ফুলবাড়ী নয়, গ্যাস রপ্তানি, মালিকানা এবং সম্প্রতি সুন্দরবন ও বাঁশখালী, রূপপুর নিয়েও একই কাজ আমাদের বরাবর করতে হয়েছে, হচ্ছে।

> বাংলাদেশের একটি বৃহৎ কয়লাখনি নিয়ে চুক্তি হয়েছে, অথচ বেশ কয়েক দিন চেষ্টা করেও সরকারি কোনো পর্যালোচনা, অবস্থানপত্র বা নীতিমালা পাওয়া গেল না—এটা বিস্ময়করই বটে, তবে আমাদের অভিজ্ঞতায় এটা নতুন কিছু ছিল না। আমরা জানি, এভাবেই চলে এই রাষ্ট্র, সর্বজনের সম্পদ (common property) নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, চুক্তি করে;

২০০৫ সালের শেষ দিকে ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির একাধিক সমাবেশে ঢাকা থেকে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ লেখক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী যোগ দেন।[৬] কোম্পানি সরকারসহ সবাইকে জানাচ্ছিল, এই প্রকল্পে এলাকার মানুষের সম্মতি আছে। এর বিপরীতে ফুলবাড়ী কমিটিসহ এলাকার বিভিন্ন সংগঠন একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের বিরোধিতাই বারবার উপস্থিত করেছে।

কয়লানীতি

২০০৬ সালের শুরুতে সরকার কয়লানীতির এক খসড়া উপস্থিত করে। জনগণ যখন এশিয়া এনার্জির ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ তৈরি করেছে, তখন প্রতারণামূলক পথে এই প্রকল্প পার করে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই যে এই কয়লানীতি প্রণয়নের পথ বাছাই করা হয় তা আমরা নীতির খসড়া পড়েই বুঝতে পারি। কয়লানীতির খসড়া তৈরির জন্য সরকার যাঁদের তখন দায়িত্ব দেয় তাঁদের পরিচয় জানলেই সরকারের দুরভিসন্ধি স্পষ্ট হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার' (আইআইএফসি)। তাদের ওয়েবসাইটে গেলাম প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে জানতে। দেখলাম পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, এই প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এজেন্সিকে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের জন্য অবকাঠামো প্রকল্প উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে থাকে।' এটি যেসব সংস্থার আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সেগুলো হলো বিশ্বব্যাংক, কানাডীয় সিডা এবং ব্রিটিশ ডিএফআইডি।[৭]

এই সেন্টারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিশ্বব্যাংক, যার মূল কাজই হলো রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সাধারণ সম্পত্তি বা কমন প্রপার্টি (পানি বন উদ্ভিদ বীজ খনিজ সম্পদ) সব ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে যাওয়া এবং বিদেশি বৃহৎ কোম্পানির লাভজনক বিনিয়োগের রাস্তা পরিষ্কার করা। তার মানে আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হলো যে বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনায় দেশের কয়লা সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য এ রকম একটি সংস্থাই উপযুক্ত, যার কাজ ব্যক্তি মুনাফাভিত্তিক বিনিয়োগে সহায়তা করা। কয়লা সম্পদ সম্পর্কে সরকারের নীতিগত অবস্থান হলো, কয়লা সম্পদ দেশের মানুষের কাজে ব্যবহার নয়, তা বিদেশি ব্যবসায়িক মালিকানায় হস্তান্তর, জনগণের সম্পত্তি ব্যক্তিগতকরণ এবং তার ধারাবাহিকতায় কয়লা বিদেশে পাচার অনুমোদন করা।[৮]

কয়লানীতি সেভাবেই দাঁড় করানো হয়েছে। এশিয়া এনার্জি ও টাটা যথাক্রমে ফুলবাড়ী ও বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা খনন করার জন্য দখল নিতে খুবই আগ্রহী। কোনো সমীক্ষা, বাছবিচার ছাড়াই সরকারি কয়লানীতির মধ্যেই টাটাকে বড়পুকুরিয়া এবং এশিয়া এনার্জিকে ফুলবাড়ীর ইজারাপ্রাপ্ত দেখিয়ে সব পরিকল্পনা করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ অনভিজ্ঞ বলে পারবে না' বলা হলেও ফুলবাড়ী দেওয়া হলো এশিয়া এনার্জিকে, কয়লাখনিতে যার কোনো অভিজ্ঞতা নেই আর প্রকল্প কাজ পাওয়ার মাত্র এক বছর আগে যার জন্ম। আর টাটার জন্য বরাদ্দ বড়পুকুরিয়া। এর আগেই আমরা জেনেছি, টাটা বড়পুকুরিয়া খনি সম্পর্কে তার প্রস্তাবে বলেছে, এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ীতে যে শর্তে উন্মুক্ত খনি করবে, টাটাও সেই শর্তে করতে আগ্রহী। সুতরাং সর্বনাশের দিক থেকে এই ঐক্য আমাদের কাজের মধ্যেও প্রতিরোধের ঐক্য তৈরি করল।

গ্যাস ও কয়লা বিষয়ে টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব

বিএনপি-জামায়াত জোটের জ্বালানি উপদেষ্টা তখন ছিলেন মাহমুদুর রহমান। এর কিছুদিন আগে তিনি ছিলেন বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান। ফুলবাড়ী প্রকল্প নিয়ে আমাদের আন্দোলনের পাশাপাশি টাটার বিভিন্ন ভয়াবহ প্রকল্প নিয়ে আমরা যখন আন্দোলন করছিলাম, তখন তিনি টাটার প্রকল্পগুলোর পক্ষে খুবই সোচ্চার ছিলেন। এ নিয়ে টিভি টক শোতে সরাসরি তাঁর সাথে আমার একাধিক বিতর্ক হয়েছে। টাটা যেসব বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছিল তার আর্থিক মূল্য ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১৬ হাজার কোটি টাকা। এটি শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, টাটার দিক থেকেও ছিল ভারতের বাইরে একটি বৃহৎ বিনিয়োগ। মূলত তিনটি ক্ষেত্র বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ছিল : বার্ষিক ২৪ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন স্টিল মিল, উন্মুক্ত কয়লাখনি এবং ১০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ প্লান্ট এবং ১০ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন সার কারখানা। এগুলো প্রধানত রপ্তানিমুখী প্রকল্প। এ ছাড়াও টাটা গোষ্ঠী মংলা পোর্ট, হোটেলসহ আরো নানা বিষয়ে বিনিয়োগের প্রস্তাব

দিয়েছিল।

সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হিসেবে টাটা কোম্পানি যেসব শর্তে গ্যাস ও কয়লা দাবি করেছে সেগুলোর মধ্যে ছিল : (১) ২০ বছর পর্যন্ত স্থির দামে এবং বিরতিহীনভাবে গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দিতে হবে। (২) ভর্তুকি দিয়ে তাদের কাছে গ্যাস বিক্রি করতে হবে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য যতটুকু এখানে তারা বিক্রি করবে তা আন্তর্জাতিক দামে কিনতে হবে। বাকি অংশ তারা রপ্তানি করবে প্রধানত ভারতে। (৩) তিনটি প্রকল্প ও কয়লাখনি মিলিয়ে প্রায় সাত হাজার একর কৃষিজমির ওপর দখলিস্বত্ব দিতে হবে, যেগুলো আর কৃষিজমি থাকবে না। (৪) ২০ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে দিতে হবে। অর্থাৎ এই সময়কালে উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি বা মুনাফার ওপর তারা বাংলাদেশকে কোনো কর দেবে না। (৫) বিদেশি বিনিয়োগ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সব সুবিধা ও ইনসেনটিভ তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

টাটার দাবি ছিল প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস তাদের দিতে হবে ১.৫ মার্কিন ডলার দরে, যেখানে অন্য বিদেশি কোম্পানি থেকে আমাদের তখন কিনতে হচ্ছে ২.৫ থেকে ৩ ডলারে। আন্তর্জাতিক বাজারে তখন দাম ৯ থেকে ১০ ডলার। দেশে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে হলেও ২০ বছরে তিন ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস কম দামে তাদের দিতে হবে, যা ব্যবহৃত হবে এমন পণ্য উৎপাদনে, যা রপ্তানি হবে। মাহমুদুর রহমান আমদানি করে হলেও, বেশি দাম দিয়ে হলেও টাটার সাথে এই চুক্তিকে বাংলাদেশের জন্য খুবই জরুরি বলে রীতিমতো জোর করছিলেন।[৯] সে জন্য আমরা বলেছিলাম, 'জ্বালানি উপদেষ্টার ভূমিকা বাংলাদেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নীতিনির্ধারকের প্রত্যাশিত ভূমিকার চেয়ে টাটাসহ বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির জনসংযোগ কর্মকর্তার সাথেই বেশি সংগতিপূর্ণ।' বলাই বাহুল্য, সরকার পরিবর্তন হলেও পরবর্তী জ্বালানি উপদেষ্টা বা কর্মকর্তাদের ভূমিকার পরিবর্তন হয়নি।

আমরা বললাম, টাটার প্রস্তাব অনুযায়ী যদি অভ্যন্তরীণ দামে তাদের গ্যাস সরবরাহ করা হয় তাহলে নিয়মিতভাবে বিপুল ভর্তুকি দিতে হবে, যা শুধু রাজস্ব ঘাটতিই তৈরি করবে না, বৈদেশিক মুদ্রার ওপরও চাপ সৃষ্টি করবে। উপরন্তু, টাটার প্রস্তাব অনুযায়ী যেকোনোভাবে তাদের বিরতিহীনভাবে ২০ বছর ধরে গ্যাস সরবরাহ করার অর্থ হচ্ছে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে ফেলা এবং দেশের উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য চাহিদা পূরণ না করে টাটার জন্য গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা। তা ছাড়া স্থির দাম মানে হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও টাটার ক্ষেত্রে তা বাড়ানো চলবে না।

আমাদের অব্যাহত প্রতিবাদ ও যুক্তি-তথ্যের সামনে দাঁড়াতে না পেরে সর্বোপরি এশিয়া এনার্জির ফুলবাড়ী প্রকল্প বিরোধী আন্দোলন থেকে বার্তা পেয়ে টাটা ১০ জুলাই তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত করে। প্রথম পর্যায়ে এটি ছিলো চাপ সৃষ্টির একটি কৌশল। তাদের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য প্রচারও শুরু হয়েছিলো। ১৩ জুলাই আমরা এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাই। আমাদের বক্তব্যে বলা হয়, "টাটা তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখার হুমকি দেওয়ার পর গত দুদিনে বিভিন্ন মহল থেকে একটি হাহাকারের রব তোলা হয়েছে। জ্বালানি উপদেষ্টাসহ বিভিন্নজন বলেছেন যে টাটার বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন না হবার অর্থ হলো বিশ্বের কাছে একটি 'রং সিগন্যাল' যাওয়া। আমরা প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কাছে এবং টাটা গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন কোম্পানির কাছেও একটি 'রাইট সিগন্যাল' দিতে চাচ্ছি। সেটা হলো, যে বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত, যে বিদেশি বিনিয়োগ এ দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথে হুমকি, যে বিদেশি বিনিয়োগ জনগণের কর্মসংস্থান নষ্ট করবে, জ্বালানি নিরাপত্তা বিপর্যস্ত করবে, যে বিদেশি বিনিয়োগ উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা খননের মাধ্যমে একটি বিরাট অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ তৈরি করবে, মরুকরণ করবে, লাখো মানুষকে উদ্বাস্তু বানাবে, বাংলাদেশের মানুষ সেই ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ চায় না।" কয়েকমাসের মধ্যে ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থান এবং অব্যাহত প্রতিরোধ টাটার পুনরায় ফিরে আসার চেষ্টার সমাপ্তি ঘটিয়েছে।

ফুলবাড়ী পথযাত্রা

ফুলবাড়ী প্রকল্প বাতিলের দাবিতে জাতীয় কমিটির প্রথম বড় কর্মসূচি হয় ২৩ থেকে ২৫ মার্চ ২০০৬, ঢাকা থেকে ফুলবাড়ী রোডমার্চ। এই কর্মসূচি ঘিরে এর আগের তিন মাস বিভিন্ন ধরনের জনসংযোগ, গোলটেবিল, সংবাদ সম্মেলন করা হয়। পোস্টার-লিফলেট ঢাকা ও ফুলবাড়ী ছাড়াও দেশের প্রায় সব অঞ্চলে মানুষের কাছে পৌছানো হয়। বিভিন্ন সভা-সমাবেশ শেষে ২৩ মার্চ সকালে মুক্তাঙ্গন থেকে শুরু হয় কর্মসূচি। পথে ১৩টি স্থানে বড় সমাবেশ ও জনসংযোগের মধ্য দিয়ে ঢাকা থেকে ফুলবাড়ীর বিভিন্ন স্থানে অনেক মানুষ প্রথমবারের মতো ফুলবাড়ী প্রকল্প সম্পর্কে জানে। আমরা ২৫ তারিখ বিরামপুরে সভা করে ফুলবাড়ী পৌছলাম দুপুরের দিকে। জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী শাখা ও ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দ যৌথভাবেই বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে আমাদের স্বাগত জানালেন এবং নিয়ে গেলেন ফুলবাড়ী সমাপনী সমাবেশস্থল নিমতলা মোড়ে।

২০ থেকে ২৫ হাজার বাঙালি আদিবাসী নারী-পুরুষের এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি ও জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে ফুলবাড়ী প্রকল্প নিয়ে নির্মিত প্রথম তথ্যচিত্র 'দুধ কয়লা' প্রদর্শিত হয়। মোল্লা সাগর এই তথ্যচিত্র বানানোর জন্য ২০০৫ সালেই প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেছেন।

এই সময়ের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা দরকার বলে মনে

সমাজে যেখানে 'উন্নয়ন' নামে শক্তিশালী আচ্ছন্নতা মানুষকে কোনো প্রশ্ন করতে দেয় না, মানুষ ও প্রকৃতির বিপন্নতা এমনকি জাতীয় স্বার্থ যেখানে তথাকথিত বিদেশি বিনিয়োগ, জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, যখন প্রকৃত লাভক্ষতির হিসাবের চেয়ে বিদ্যমান উন্নয়ন চিন্তায় লুণ্ঠন, আধিপত্য আর ধ্বংসকে চিনি দিয়ে মুড়ে মহিমান্বিত করা হয়, যেখানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদসহ বিশেষজ্ঞরা এসবের সুবিধাভোগী এবং অন্ধ প্রচারক, সেখানে এ রকম প্রকল্প সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক/বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই খুব কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ফুলবাড়ী নয়, গ্যাস রপ্তানি, মালিকানা এবং সম্প্রতি সুন্দরবন ও বাঁশখালী, রূপপুর নিয়েও একই কাজ আমাদের বরাবর করতে হয়েছে, হচ্ছে।

করি। ঢাকা থেকে ফুলবাড়ী যাত্রাপথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র আমাকে বারবারই যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিল সব মিলিয়ে তা ছিল এ রকম : 'স্যার, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো স্যার এশিয়া এনার্জির কনসালটেন্সি করছেন। হয়তো না বুঝেই করছেন। আমরা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী তাঁদের সাথে বসেছিলাম। এই প্রকল্পের আসল চেহারা স্যারদের বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছি। মনে হয়, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, বলেছেন, তাঁরা এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করে বক্তব্য দেবেন। এবার ফিরেই তাঁদের নিয়ে আবার ফুলবাড়ী আসব। আপনারা সহায়তা করবেন।' আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলাম। ছাত্রছাত্রীরা বিপথগামী শিক্ষককে শিক্ষিত করার চেষ্টা করছে, এর চেয়ে আনন্দ ও ভরসার জায়গা আর কী হতে পারে!

তিন দিনের কর্মসূচি শেষে রাতেই আমাদের ঢাকায় রওনা হবার কথা। অপেক্ষা করছি সবার জন্য। নানাজনের অভিজ্ঞতা মতামত পরামর্শ শুনছি। ঢাকার সহযাত্রী হাসি আপা এলাকার বিভিন্ন নারীর সঙ্গে কথাবার্তার বিষয়ে বলছিলেন। বললেন, 'মেয়েদের সবার এক কথা। বুকের মধ্যে সব সময় এক আতঙ্ক, কখন চলে যেতে হয়।' মেয়েদের মধ্যে আতঙ্ক আরো বেশি। সংসার-সন্তান, সামাজিক সম্পর্কগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ নারী, তার ঘাড়েই দায়িত্ব বেশি, সংকটে বিপদ তাই তারই বেশি।

ছাত্রছাত্রীরা বিপথগামী শিক্ষককে শিক্ষিত করার চেষ্টা করছে, এর চেয়ে আনন্দ ও ভরসার জায়গা আর কী হতে পারে!

ধীরে ধীরে সবাই হাজির, বাস প্রস্তুত। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে, রাত ১২টা বেজে গেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রটির খোঁজ নেই। উদ্বিগ্নই হচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, সেই ছাত্র দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির। ঘর্মাক্ত, হাঁপাচ্ছে। বাসের সামনে এসে বসে পড়ল। জিজ্ঞেস করতেই উত্তর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল :

'স্যার, আমাদের সেই স্যার তো এখানেই! এশিয়া এনার্জির গেস্টহাউজে!!'

'মানে?'

'আমি হঠাৎ স্যারের ড্রাইভারকে দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করতেই বলল, স্যার কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এশিয়া এনার্জির কাজেই এসেছেন। সেটা শুনে গেলাম চাক্ষুষ দেখতে। গেস্টহাউজে তো ঢোকা যায় না, বিরাট আয়োজন, নিরাপত্তার শেষ নাই। দেখলাম, ঠিকই। কিন্তু এই স্যার যে আবারও এশিয়া এনার্জির কাজেই আসবেন, ভাবি নাই। আমার সাথে তাহলে কী বললেন তিনি?' বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায়, হতাশায় ছেলেটি কাঁদছিল।

সরল বিশ্বাসে ছাত্রটি ভেবেছিল, ও তার শিক্ষকের ভুল ভাঙাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যে তার ইজ্জত বিক্রি করে বসে আছে তার ভুল ও কী করে ভাঙাবে? এ রকম বিশেষজ্ঞ ও কনসালট্যান্টদের মোকাবিলা করতে হয়েছে আমাদের সব সময়ই, এখনো হচ্ছে। আমরা তাই সব সময়ই বলি, কোনো ব্যক্তি যতই বিশেষজ্ঞ হন, যতই তাঁর ডিগ্রি থাকুক, তিনি যদি কোম্পানির কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন, তখন আর তাঁর মতামত বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, তাঁকে কোম্পানির ভাড়াটে কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রতিরোধের আরেক ধরন

এশিয়া এনার্জির ঘুষ কর্মসূচি ফুলবাড়ী থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বিস্তৃত ছিল। বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনীতিবিদ, ভূতাত্ত্বিক, প্রকৌশলীদের গিলে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে প্রথমেই। বিভিন্ন রকম কনসালটেন্সি দিয়ে তাঁদের বশ করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন অর্থকরী ব্যবস্থা করে সাংবাদিকদের মধ্যে একটা সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। সংবাদপত্রের মালিকদের সাথেও তারা একটা স্বার্থের সম্পর্ক তৈরি করেছে। মন্ত্রী-আমলাদের মধ্যে তাদের একটা সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সে জন্যই বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষিত মহলের যে সংখ্যায় অংশগ্রহণটা থাকা দরকার সেটা আমরা পাইনি কখনোই। বিশেষজ্ঞদের যাঁরা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন তাঁদের সংখ্যা এখনো খুব কমই। নীরব একটা বড় অংশ আছেন সহানুভূতিশীল, কিন্তু সক্রিয় নন। এসব ঘুষের সুবিধাভোগী হিসেবে একজন আমলার হয়তো বিদেশে একটা বাড়ি হয়, একজন মন্ত্রীর হয়তো বিদেশে গোপন ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ে, একজন সাংবাদিকের হয়তো কিছু বিদেশ সফর হয়, একজন কনসালট্যান্টের হয়তো আয় বাড়ে বা বিদেশ সফর হয়। তার বদলে তাঁরা দেশের যে কত বড় সর্বনাশ করেন, মানুষের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যে কিভাবে বিপর্যস্ত করেন তা পরিমাপ করা কঠিন।

এশিয়া এনার্জি এবং তার পৃষ্ঠপোষকদের হয়তো ধারণা ছিল, যে দেশে মন্ত্রী, বড় বড় আমলা, দামি দামি উকিল, বিশেষজ্ঞ কনসালট্যান্ট, সাংবাদিক ইত্যাদি কেনা সহজ, সে দেশে ঐ অঞ্চলের গরিব মানুষ কেনা যাবে না–এটা তো হতে পারে না। মিডিয়া সাথে আছে, প্রচারণা সামনে আছে, কনসালট্যান্ট ও বুদ্ধিজীবী পকেটে আছে। আর কে ঠেকায়?

কিন্তু ঢাকা শহরের সচ্ছল অনেক 'বিশেষজ্ঞ', আইনজীবী, পরিবেশবিদ, ভূতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, সাংবাদিককে কিনতে সক্ষম হলেও এশিয়া এনার্জি খনি এলাকায় একই কাজ করতে গিয়ে বাধা পেয়েছে বারবার। প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই যারা অভাবগ্রস্ত, টাকা যাদের জীবনরক্ষার জন্যই দরকার। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি, যেখানে দেখি অনেক সচ্ছল লোকের কাছে না হলেও গ্রামের এই গরিব মানুষদের কাছে টাকার চেয়ে নিজের ইজ্জত অনেক বড়, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থ অনেক বড়। ওদের নিয়ে ২০০৬ সালেই আমি লিখেছিলাম।

জবা রানী এক কিশোরী মেয়ের নাম। ফুলবাড়ী থানা শহর থেকে বেশ দূরে ওদের গ্রাম। ওর বাবা বিজয় আর মা ডালিমা বালার সংসার সচ্ছল তো নয়ই, ন্যূনতম চাহিদা পূরণও তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়নি। দিনমজুরি বিজয়ের পেশা। এই পেশায় কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। সব সময় কাজও থাকে না। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতো বিজয়ের জীবনও তাই অনিশ্চয়তায়ই কাটে বছরের বেশির ভাগ সময়, তাদের সব সময়ই বাস করতে হয় শীর্ণ সুতার ওপর। একটু অসুস্থতা, কদিনের কাজের সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি–সবকিছুই তাদের জন্য একেকটি ঝড়ের মতো। খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে হয়।

মানুষের প্রতিরোধক্ষমতা নষ্ট করার কৌশল হলো তার দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করা আর সেখানে আঘাত করা। বিজয়ের দুর্বল জায়গায় ছিল তার মেয়ে। আমাদের বিবেচনায় তখনো আসলে মেয়ের বিয়ের বয়স হয়নি। কিন্তু গ্রামে সেই মেয়ের বিয়ে নিয়েই তখন অনেক কথা, 'মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে গেল। এখনো কেন দাও না? পরে আর ছেলে কোথায় পাবা?' বিজয় কথা বলে না, কিন্তু চিন্তা বাড়ে। মেয়ের বিয়ে যে-সে ভাবে দিলেও পণ লাগবে। কোথায় পাবে সে টাকা? এমনিতেই তো ঋণ। এমন তো নয় যে মেয়ের পড়াশোনা

চালানো যাচ্ছে বা সহায়-সম্বল অনেক আছে, মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই।

এসব দুর্ভাবনা আর কানাকানির মধ্যেই একদিন বিজয়-ডালিমার ভাঙা ঘরে এসে হাজির হলো এশিয়া এনার্জি বা কোম্পানির লোক। ভাঙা ঘরের সামনে নানা কিছু জোড়াতালি দিতে তখন ব্যস্ত বিজয়। কোম্পানির লোক কাছে এসে ফিসফিস করে বিজয়কে বলে :

'কি গো, মেয়ের বিয়া দিবা না?'

'দিব তো, মুখের কথায় তো হবে না।' তিক্ত কণ্ঠে বলে বিজয়।

'কোম্পানি তো তোমার কথা খুব ভাবে।'

'মানে?'

'মানে আর কী? তোমার মেয়ের বিয়ে দিবা। আর ঘরটা ঠিক না করলেও তো চলে না। সে ব্যবস্থা করবে কোম্পানিই।'

'পরিষ্কার করে বলো।'

'শোনো তবে। কোম্পানি তোমার জন্য ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। ২০ হাজার টাকা আজকেই পাবা। লোক দাঁড়িয়ে আছে সাইকেল নিয়ে একটু দূরে। বাকি টাকা পাবা পরে।' ৬০ হাজার টাকা বিজয়ের জন্য অনেক বেশি টাকা। এই টাকা সারা জীবনেও তার পক্ষে জমানো সম্ভব নয়। কয়েক বছরের মোট আয়ের চেয়েও বেশি এই টাকা, অথচ এই টাকা এমনি এমনি পাওয়া যাচ্ছে। মেয়ের বিয়ে দেওয়া আর ঘর ঠিক করা–দুটো জরুরি কাজই এতে হয়ে যায়। আর কোনো পথই তো খোলা নেই।

হাতের কাজে আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিজয়। কয়েক মিনিট গেল চুপচাপ। কোম্পানির লোক উৎসাহিত হয়ে বলে :

'জীবনে সুযোগ দুইবার আসে না। এ রকম সুযোগ আসে, বলো?'

বিজয়ের গলা উঠতে গিয়েও নামে। বলে :

'তা, কী করতে হবে আমার এর বদলে?'

কোম্পানির লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে :

'তেমন কিছুই না। মিছিল-টিছিলে যাওয়া বন্ধ করার দরকার নাই। বন্ধ করলে আবার নানা কথা উঠবে। মিটিংয়েও যাও, তবে অত বেশি যাওয়ার দরকার নাই। আর মানুষজনরে জড়ো করার এত কাজ তোমার নেওয়ার দরকার কী? সেটা আর করবা না। তবে মিটিংটিটিংয়ের খবর-টবর একটু দিবা। এই তো।'

আরো কয়েক মিনিট যায়। ঘরের বেড়ায় গুনা বাঁধার কাজে বিজয়ের হাত একটু জোরে জোরে চলতে থাকে। তারপর তা থামে। বিজয় মুখ তুলে বলে, 'বাড়ির উঠানে এসব কথা বললা। তোমারে যা করার দরকার তা করতে পারলাম না। এবার তুমি তাড়াতাড়ি যাও। আমার মাথা কখন কী হয় বলতে পারি না।'

কোম্পানির লোক কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। উঠে পড়বে নাকি আরেকবার বোঝাবে তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে কিছু বলতে যেতেই ভাঙা ঘরের ওপার থেকে রণমূর্তি নিয়ে ছুটে আসে বিজয়ের বউ ডালিমা বালা। হাতে ঝাঁটা; মাটির দিকে নয়, আকাশমুখী থেকে কোম্পানিমুখী হচ্ছে।

বিজয়ের মতো ঠাণ্ডাভাবে নয়, চিৎকার তখন ডালিমার কণ্ঠে, ক্রোধ শরীরের গতিতে :

'ঐ গোলামের পুত গোলাম। নিজে গোলাম হইচস, আমাদেরও গোলাম বানাইতে চাস। বাইর হ। বাইর হ।'

আর দ্বিধা থাকে না কোম্পানির। ছুটে বের হয়ে যায়।

এরপর আর মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তা করার ফুরসত মেলেনি বিজয়ের। কারণ এই ঘটনার পর তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। তার কাছে পরিষ্কার হয় যে কোম্পানির মতলব খুব খারাপ, যেকোনো সময় সবকিছু দখল করে নিতে পারে। দালাল তৈরির চেষ্টা সফল হলে তো সর্বনাশ। লোক জড়ো করা, মিছিল-মিটিং করা–এসব কাজে বিজয়ের সময় বেড়ে গেল অনেক। ঘরে খাবার নেই, তার পরও ডালিমা বালা, জবা রানীও বিজয়ের সাথে কাজে নেমে পড়ে।

এ রকম ঘটনা ফুলবাড়ী অঞ্চলে আরো অনেক ঘটেছে। কিছুটা সচ্ছল লোকজনের ক্ষেত্রেও। হামিদপুর ইউনিয়নের একজন ছোট ব্যবসায়ী পাঁচ লাখ টাকার ব্যবসা প্রত্যাখ্যান করে নিজের পুঁজি ভেঙে টাকা খরচ করেছেন আন্দোলনের সময়, এ রকমও আছে।

এ সময়ই এশিয়া এনার্জি এলাকায় বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য রঙিন টিভি দিতে থাকে। গোটা ৩৫ দেওয়ার পর যে টিভি ছাড়া মানুষদের আগ্রহ ভরে টিভি নেওয়ার কথা তারাই পণ্ড করে দিয়েছে এই 'দয়ার' কার্যক্রম। ২৬ আগস্ট কোম্পানিবিরোধী জমায়েতে গুলির পর থামার বদলে আন্দোলন যখন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়, তখন এই অঞ্চলের মানুষ দালাল বলে পরিচিত ব্যক্তিদের বাসা থেকে এই টিভিগুলো বের করে। ঘৃণা এতটাই যে কোনো গরিব মানুষ, যাদের জীবনেও এ রকম রঙিন টিভি কেনার সাধ্য হবে না, তারা কেউই এই টিভি ঘরে নেওয়ার বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ দেখায়নি, বরং সেগুলো সব টুকরো টুকরো করে ভেঙেছে।

> আমরা তাই সব সময়ই বলি, কোনো ব্যক্তি যতই বিশেষজ্ঞ হন, যতই তাঁর ডিগ্রি থাকুক, তিনি যদি কোম্পানির কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন, তখন আর তাঁর মতামত বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, তাঁকে কোম্পানির ভাড়াটে কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

কোথা থেকে বিজয়-ডালিমা বালার মতো 'গরিব' মানুষদের এই তেজ আসে? দুর্বল অনাহারী শরীরের মানুষেরা কী করে এক বছরে যা তাদের আয় করা সম্ভব তার কয়েক গুণ বেশি অর্থ থু থু মেরে, ঝাঁটা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে? ব্যাখ্যা একটাই–ইজ্জতের বোধ। তাহলে শহরে, এই রাজধানী ঢাকায় যাদের সহায়-সম্বল আছে, অনেক টাকা-পয়সা আছে, কনসালট্যান্ট সাংবাদিক আমলা আইনজীবী মন্ত্রী, তাদের কাউকে কাউকে যে নানা জাতের কোম্পানি নাকে দড়ি দিয়ে অপকর্মে ব্যবহার করে, তাদের ইজ্জতের বোধ কোথায় গেল? ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থান এই প্রশ্নটাই হাজির করে সবার সামনে, ঘৃণা আর ধিক্কার ছুড়ে দেয় বেইজ্জত 'ভদ্রলোক'দের উদ্দেশে।[১০]

অপপ্রচার মোকাবিলা: আন্দোলনে নতুন গতি

মার্চের সফল কর্মসূচির পর বিপদগ্রস্ত চার থানার মানুষদের প্রত্যাশা বেড়ে গেল অনেক। অন্যদিকে এশিয়া এনার্জি ও তার পৃষ্ঠপোষকদেরও তৎপরতাও বাড়তে থাকে। আমাদের রোডমার্চের সময়ই জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, এশিয়া এনার্জির সঙ্গে ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে চুক্তি জাতীয় স্বার্থবিরোধী। তিনি তখন এও বলেন যে যারা এই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। অথচ তিনিই আবার বলতে থাকেন, এই চুক্তি বাতিল করা যাবে না। আর তাঁর আমলেই কয়লানীতির মাধ্যমে টাটা ও এশিয়া এনার্জির জন্য যথাক্রমে বড়পুকুরিয়া ও ফুলবাড়ীতে উন্নয়নের নামে উন্মুক্ত খনির ধ্বংসযজ্ঞ ও লুণ্ঠন কর্মসূচিকে বৈধতাদানের চেষ্টা জোরদার হয় এবং এশিয়া এনার্জির পক্ষে কিংবা তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নানা প্রলাপ বকতে থাকেন, যা প্রকট আকার ধারণ করে ২৬

আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর।

যা হোক, আমরা পরিষ্কার দেখছিলাম, এশিয়া এনার্জি যখন তাদের তৎপরতা বাড়াচ্ছে, পুনর্বাসনের জন্য মডেল টাউন বানানো শুরু করেছে, বিভিন্নজনকে ঘুষ দিয়ে দলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন এসব ঘটনায় ফলাফল হয়েছে উল্টো। ফুলবাড়ী বিরামপুর পার্বতীপুর নবাবগঞ্জসহ উত্তরবঙ্গের মানুষেরা অস্থির হয়ে যাচ্ছিল, তারা আর কত আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবে? তারা চাচ্ছিল দ্রুত এ বিষয়ের এসপার-ওসপার করতে, এশিয়া এনার্জিকে তাড়াতে।

ঢাকায়ও টাটা ও এশিয়া এনার্জির ভয়াবহ প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হচ্ছিল তখন। সুধী সমাবেশ, মতবিনিময় সভা, সংবাদ সম্মেলন থেকে হাট-মাঠ-নগর সমাবেশ। ঢাকায় বাড়তি ছিল কোম্পানির প্রচারণা মোকাবিলা করা। দেশের বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র তখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রচারণা সংগঠিত করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ব্রায়ান মুনি, বিভিন্ন মিডিয়ায় তাঁর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বিশেষজ্ঞ বলে, তিনি আসলে একজন সাংবাদিক, পিআর–জনসংযোগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর পাশাপাশি প্রচারের অগ্রভাগে ছিলেন খনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডিগ্রিপ্রাপ্ত মুশফিকুর রহমান, যিনি ছিলেন কোম্পানির একজন কর্মকর্তা। তিনি নিয়মিত প্রকল্পের পক্ষে লিখেছেন। তবে লেখার নিচে পরিচয় দেওয়া থাকত 'খনি বিশেষজ্ঞ', কখনোই কোম্পানির কর্মকর্তার পরিচয় দেওয়া হতো না। ঐ পরিচয় দিলেই নিরপেক্ষ বা বিশেষজ্ঞ ভাবটা থাকবে না সে জন্য! লিখেছেন সালেক সুফি বলে একজন বহুজাতিক কোম্পানির কনসালট্যান্ট। তিনি একাধিক নামে নিয়মিতভাবে লিখেছেন নিজের স্বার্থযোগ গোপন করে। দেশের আরো কয়েকজন সাংবাদিক নির্দিষ্টভাবে কোম্পানির পক্ষে জনমত তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এদের জন্য বিজ্ঞাপন ছিলো প্রকাশ্য ঘুষ। এ ছাড়া সক্রিয় ছিলেন মার্কিন নাগরিক ফরেস্ট কুকসনসহ বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক কর্পোরেট লবিস্ট। এদের বিরুদ্ধে আমাদের সবসময়ই সজাগ থাকতে হয়েছে।

> 'ঐ গোলামের পুত গোলাম। নিজে গোলাম হইচস, আমাদেরও গোলাম বানাইতে চাস। বাইর হ। বাইর হ।'

একদিকে সংবাদপত্রে লেখা, টিভি টক শো, সাক্ষাৎকার, সংবাদ সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ভুল তথ্য, ভুল যুক্তি ও প্রচারণা খণ্ডন করতে সদা তৎপর থেকেছি; অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ-প্রতিরোধে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে 'এলাকার জনগণ এই প্রকল্প সমর্থন করে'–এই প্রচারণা একটা ডাহা মিথ্যা। তত দিনে দেশে দেশে উন্মুক্ত কয়লাখনির বিষপ্রভাব নিয়ে আরো তথ্য যত বেশি পাচ্ছিলাম তত আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। কেননা আমরা আরো নিশ্চিত হচ্ছিলাম যে এ ধরনের প্রকল্পে পানি, আবাদি জমি আর মানুষের কারণে বাংলাদেশে যে ক্ষতি হবে তা চিন্তা করাও কঠিন। এই ক্ষতি সামাল দেয়া বাংলাদেশের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না।

এলাকার মানুষের উদ্বেগ, অস্থিরতা আর তেজের সাথে তাল মেলাতে পারছিল না 'ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি', বরং জনগণ যতই প্রতিরোধ চেতনায় অগ্রসর হচ্ছিল, ততই যেন ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন কমিটির নেতৃবৃন্দ। এর কারণও বোধগম্য। সরকারি জোট এবং বৃহৎ বিরোধী দল বহুজাতিক পুঁজি বিরোধী এ ধরনের আন্দোলন হজম করতে সক্ষম নয়। সুতরাং সেসব দলের কেন্দ্র যে তাদের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের এই আন্দোলনের নেতৃত্বদানে উত্তরোত্তর বিরক্ত হচ্ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া স্থানীয় এমপিসহ নেতৃবৃন্দের কারো কারো কোম্পানির সাথে লেনদেনের সম্পর্ক নিয়েও মানুষ কথা বলছিল। এই নেতৃবৃন্দের পিছুটান, ধীরগতি নিয়ে জনগণের মধ্যে তাই অনাস্থা আর অসন্তোষও বাড়ছিল। তারা বুঝতে পারছিল, এই নেতৃত্ব আর অগ্রসর হবে না, এদের হাতে নেতৃত্ব থাকা মানে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের চাপ এবং অগ্রসর সংগঠকদের উপলব্ধির কারণে এলাকা থেকেই দাবি এলো সেখানে জাতীয় কমিটির শাখা সক্রিয় করার।

তত দিনে ফুলবাড়ী আন্দোলন এবং কয়লাসহ খনিজ সম্পদ বিষয় যুক্ত করার তাগিদে জাতীয় কমিটিতে খনিজ সম্পদ শব্দটি যোগ হয়েছে। নাম দাঁড়িয়েছে 'তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। দিনাজপুর কমিটি আগে থেকেই ছিল, এর মধ্যে ফুলবাড়ী থানা কমিটিও সক্রিয় হয়েছে। প্রথম আহ্বায়ক হলেন সৈয়দ সাইফুল ইসলাম জুয়েল এবং সদস্যসচিব এস এম নূরুজ্জামান। কয়েকমাস পর দায়িত্ব নেন আবদুল মজিদ চৌধুরী। ফুলবাড়ী কমিটিতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত বাদে বাকি প্রায় সকল দল ও সংগঠন যোগ দিল। উপরোক্ত কোনো কোনো দলের কর্মী-সমর্থকরাও কমিটির নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। পরিস্থিতি এ রকম যে বেশির ভাগ নেতা কোম্পানির সাথে আর কর্মী-জনতা সবাই আন্দোলনের সাথে। তার পরও আমাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করে বলা হলো যে এই কমিটি সর্বতোভাবেই নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে জনগণের ঐক্য সম্প্রসারণ করতে কাজ করবে। ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি যদি কার্যক্রম গ্রহণ করে তাতে সহযোগিতা করবে, প্রয়োজনে যৌথভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

যুক্তি, তথ্য ও জনমত সত্ত্বেও সরকার যখন এশিয়া এনার্জিকে প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সব রকম সহযোগিতা অব্যাহত রাখল, তখন এলাকা থেকেই বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণের চাপ এলো। সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব এলো এশিয়া এনার্জি ঘেরাও কর্মসূচি দেওয়ার। জনগণের চাপেই এই কর্মসূচি চূড়ান্ত হলো। তারিখ চূড়ান্ত হলো ২৬ আগস্ট ২০০৬। প্রতি শনিবার বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি তখন চলছিলই। গ্রাম-ইউনিয়ন পর্যায়ে জাতীয় কমিটির শাখা কমিটি গঠনের জন্য সভা-সমাবেশ তৎপরতা বাড়ল। জাতীয় কমিটির শরীক দল হিসেবে এলাকায় তখন সক্রিয় ছিল জাতীয় গণফ্রন্ট, কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টি। এছাড়া সেসময় ৫ বামদল বলে একটি জোট ছিলো, তার নেতা কর্মীরাও বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। বাসদ, ন্যাপ, গণসংহতি আন্দোলন, বিপ্লবী ঐক্যফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টিসহ বিভিন্ন শরীক দলের তখন এলাকায় সংগঠন না থাকলেও নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সক্রিয় থেকেছেন। জাতীয় কমিটির শরীক বিভিন্ন দলের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক সংগঠন ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় ১৬টি সংগঠন নিজ নিজ উদ্যোগেই কাজ করছিল। এগুলোর মধ্যে ছিলো, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ফুলবাড়ী ব্যবসায়ী সমিতি, রিকশা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, হোটেল কর্মচারী শ্রমিক ইউনিযন, দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন, কুলিশ্রমিক ইউনিয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফুলবাড়ীর প্রচেষ্টা গ্রন্থাগারের সদস্যরা আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে সবসময়ই সক্রিয় ছিলেন। এর বাইরে বহুসংখ্যক ব্যক্তিও বিভিন্নভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। জাতীয় কমিটির সংগঠক হিসেবে বীরগঞ্জের এসএমএ খালেক নিয়মিতভাবে এলাকার কাজ তদারকি করেছেন।

এর মধ্যে ফুলবাড়ী প্রশ্ন সামনে রেখে দিনাজপুর জেলা শাখা ও

বিভিন্ন থানায় সাংগঠনিক কার্যক্রম পুনর্গঠন ও জোরদারের জন্য আমরা ঘন ঘন এসব এলাকা সফর করছিলাম। এই সময়ে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও একাধিকবার গেছেন মেহেদী হাসান ও নাসরিন সিরাজ এ্যানী। রোডমার্চ এবং জাতীয় কমিটির কার্যক্রম জোরদার করবার পর আন্দোলনের গতি বেড়ে গেল এলাকায়। এপ্রিল-মে মাসে দিনাজপুর, রংপুর ও ফুলবাড়ীতে অনেকগুলো সফল কর্মসূচি হলো। প্রকল্প এলাকার অন্যান্য থানা–পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ, বিরামপুরেও নানা কর্মসূচি হচ্ছিল।

ঢাকায় অধ্যয়নরত ফুলবাড়ীর ছাত্রছাত্রীরা এর আগেই গঠন করেছিল 'জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ফুলবাড়ী কয়লা খনি প্রকল্প প্রতিরোধ আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন। ঢাকাতে তারা বিভিন্ন কর্মসূচিও পালন করেছে। ফুলবাড়ীতেও ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে অংশ নিতে থাকে। এসব উদ্যোগে সঞ্জিতপ্রসাদ জিতু, শাহরিয়ার সানিসহ বেশ কয়েকজন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফুলবাড়ী সহ প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন থানা এবং ঢাকার অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কর্মীদের ভূমিকাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। ফুলবাড়ীর 'সুরবাণী শিল্পী গোষ্ঠী' এবং তার পরিচালক প্রবীর কুমার দাস গানের মধ্য দিয়েই একটানা ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনের উদ্দীপনায় অনেক নতুন শিল্পীও তৈরি হয়েছে। কৃষক খাদেমুল ইসলামের 'মার ঝাঁটা মার এশিয়া এনার্জি...' গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ঢাকা থেকে গণসংস্কৃতি ফ্রন্ট, সমগীত, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সৃজন, সংস্কৃতির নয়া সেতু, প্রপদ, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, মওলানা ভাসানী পরিষদ বিভিন্নভাবে ভুমিকা পালন করেছেন। কামরুদ্দীন আবসার, এনামুল লতিফ, মফিজুর রহমান লাল্টু, নুজহাত মনীষা, আহসান সহ অনেকে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে মানুষের আন্দোলনে গানের মাধ্যমে সহযাত্রী হয়েছেন, সংগঠকের কাজ করেছেন। রংপুরের মওদুদ আহমেদ লিখেছিলেন 'কয়লা নিয়ে পালাচ্ছে কে, ধর...', সুরও তাঁরই দেয়া। এই গান আন্দোলনের অংশ হয়ে গিয়েছিলো।[১১] ফুলবাড়ীর শিল্পী সাইফুল ইসলাম ছবি আঁকছিলেন।

> কোথা থেকে বিজয়-ডালিমা বালার মতো 'গরিব' মানুষদের এই তেজ আসে? দুর্বল অনাহারী শরীরের মানুষেরা কী করে এক বছরে যা তাদের আয় করা সম্ভব তার কয়েক গুণ বেশি অর্থ থু থু মেরে, ঝাঁটা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে? ব্যাখ্যা একটাই–ইজ্জতের বোধ।

আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবার এক পর্যায়ে জুলাই মাসে ফুলবাড়ীতে এক প্রস্তুতি সভায় যোগদান করতে গেলাম আমি ও শহীদুল্লাহ ভাই। সভায় সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে বসলাম। আমরা চাইলাম ২৬ আগস্ট ঘেরাও কর্মসূচি সম্মিলিতভাবেই হোক, আন্দোলনের ঐক্য যেন কোনোভাবেই বিনষ্ট না হয়। আমরা তাঁদের বললাম, ফুলবাড়ী বাঁচাতে, বাংলাদেশ বাঁচাতে এই কর্মসূচি সফল করতেই হবে। এই কর্মসূচি আপনাদের ব্যানারেও যদি আপনারা করেন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। যে ব্যানারেই হোক, সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। তাঁরা এর আগের সমাবেশে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টির সরকারে থাকাকালীন ভূমিকার সমালোচনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কর্মসূচি নিয়ে কোনো অঙ্গীকার করলেন না, চিন্তা করে জানাবেন বললেন। পরে আর জানাননি।

এই জুলাই মাসে লন্ডন থেকে এক বিবিসি সাংবাদিক কথা বলতে এলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেন আমরা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করি সে সম্পর্কে বিস্তারিত শুনলেন। জানালেন, কোম্পানির কর্মকর্তাদের সাথেও তাঁর বিস্তারিত কথা হয়েছে। আমার যুক্তি ও তথ্যে মনে হলো তাঁর অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়েছে। যাওয়ার সময় তিনি শুধু বললেন, 'জানি না কতটুকু ঠিকমতো এই রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারব। তবে একটি কথা তোমাকে বলে যাই, খুব সাবধানে থাকবে। এরা ভয়ংকর!' পরে কোম্পানির বক্তব্যের ওপর জোর দিয়ে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল, তবে অন্য নামে। (বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ১২ জুলাই ২০০৬)

২৪ থেকে ২৬ আগস্ট

এশিয়া এনার্জি, সরকার ও তার পক্ষে প্রচারক গোষ্ঠীর দুষ্টচক্রের তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে দুমাস আগে ঘোষিত হয়েছিলো '২৫ আগস্টের মধ্যে জমি মানুষ ও প্রকৃতি বিনাশী ফুলবাড়ী প্রকল্প বাতিল এবং ফুলবাড়ী ত্যাগ না করলে ২৬ আগস্ট এশিয়া এনার্জি ঘেরাও কর্মসূচি'। ২৩ আগস্ট ঢাকায় জাতীয় কমিটি আহূত সংবাদ সম্মেলনে আমরা এই কর্মসূচি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি এবং এই প্রকল্প বাতিলের জন্য সরকারের কাছে আবারো দাবি জানাই। ২৪ আগস্ট মেহেদীসহ আমি পৌঁছলাম ফুলবাড়ীতে। সেদিন ফুলবাড়ীতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বড় সমাবেশ ছিল। এ ছাড়া ছিল প্রস্তুতি সভা। একটি স্কুলে সভা হলো, ঘরে-বাইরে বাঙালি আদিবাসী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা অনেক মানুষ। সভার মূল বিষয় ২৬ আগস্ট সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করা, সবার মধ্যে চিন্তা ও কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করা। সেদিনই বুঝতে পারছিলাম, আমরা যত ভেবেছি লোকসমাগম তার চেয়ে অনেক বেশি হবে। সে জন্য এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে আরো সতর্ক থাকতে হবে, এর ঝুঁকিও বিবেচনায় নিতে হবে বেশি।

অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা আমার মতো আরো অনেকের মধ্যেই ছিল। কোম্পানি পুরো কর্মসূচি ভণ্ডুল করার জন্য ভেতর থেকে সন্ত্রাস ঘটাতে পারে, হামলা করে 'জঙ্গি' বলে চালিয়ে দিতে পারে। ২০০৫ থেকেই ইসলামের নামে সন্ত্রাসী তৎপরতা অনেক বেড়েছে। এ রকম কোনো বাহিনীকে কোম্পানির পক্ষে ভাড়া খাটানো যে অসম্ভব নয়, সেটাও আমরা বুঝতে পারছিলাম। সুতরাং শক্তিশালী অনেকগুলো স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হলো, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা করা হলো।

আলোচনায় এলো বিভিন্ন এলাকায় কোম্পানির পক্ষে নানা তৎপরতা ও প্রচারণা চলছে, যাতে এই কর্মসূচিতে মানুষ না আসে। কোথাও বলা হচ্ছে, 'এই ঘেরাওতে কোনো বড় দল নাই, লোক হবে না, উল্টা ধরপাকড় হবে', 'ঐ দিন অনেক গণ্ডগোল হবে, গোলাগুলি হবে, ঐখানে যাবার দরকার নাই', 'এশিয়া এনার্জিকে কেউ ঠেকাতে পারবে না, শুধু শুধু জীবন দিয়ে লাভ আছে?' ইত্যাদি। এদিকে একই সময়ে পুরো এলাকায় গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। পুলিশ, র‍্যাব ছাড়াও সরকারের সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ঘোরাঘুরি করছে; জুয়েল, বাবলু, মজিদ চৌধুরী, হামিদুল, জামানসহ ফুলবাড়ী নেতৃবৃন্দের কাছে বারবার আসছে, মোবাইল করছে। মানসিক চাপ তৈরির সব রকম আয়োজন চলছে।

২৫ আগস্ট হাতে পেলাম ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষর করা একটি চিঠি, তাঁরা এটা প্রশাসনের কাছে দিয়েছেন, একই সঙ্গে একই বক্তব্য দিয়ে ফুলবাড়ী থানায় জিডিও করা হয়েছে। এতে বলা

হয়েছে: "...আগামী ২৬ আগস্ট 'এশিয়া এনার্জি দেশ ছাড়' এবং 'এশিয়া এনার্জি অফিস ঘেরাও' উক্ত কর্মসূচি ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির কর্মসূচির এখতিয়ার-বহির্ভূত কর্মসূচি। অতএব, উক্ত ঘোষিত কর্মসূচি তারিখে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটি কোনভাবেই দায়ী নয়।" এটি আবার হাজার হাজার কপি করে বিতরণও করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। আমাদের জন্য এটা বোঝা কঠিন ছিল না যে ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির নামে ছড়ানো এই পত্র ছিল কোম্পানির সাথে যোগসাজশে এশিয়া এনার্জি ঘেরাও কর্মসূচি ভণ্ডুল করার একটা অপচেষ্টা, মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করা, কোম্পানিকে সাহস দেওয়া। অন্যদিকে সারা দিন মিছিলের পর মিছিল বিভিন্ন প্রান্তে। ফুলবাড়ী নেতৃবৃন্দ প্রবল মানসিক ও শারীরিক চাপ উপেক্ষা করে দিনের পর দিন কঠিন পরিশ্রম করছেন, প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে। বিকেলের দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে একাধিক মিছিল। উচ্ছেদের পর প্রকল্প এলাকার মানুষদের জন্য পুনর্বাসনের 'মডেল টাউন' নামে খুপরি মার্কা নির্মাণাধীন ৫ ইঞ্চি ইটের দেয়াল দিয়ে ঘরের কাজ চলছিল, সেগুলো হয়ে দাঁড়াল মানুষের ক্রোধের ক্ষেত্র, সেসব কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এই 'মডেল টাউন' করা হয়েছিল মানুষকে তাদের 'উজ্জ্বল ভবিষ্যতের' নমুনা দেখানোর জন্য, বানিয়ে বানিয়ে 'ক্ষতিপূরণের' লাখ লাখ টাকার গল্প বলা হয়েছে মানুষকে লোভ দেখানোর জন্য, উল্টো এগুলোই মানুষের ক্ষোভ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ক্ষতিপূরণ ছিল কোম্পানির এক বিশেষ প্রচারণা। কিন্তু আমরা দেখলাম, আন্দোলনে গরিব মানুষই বেশি বেশি আসছে। তাদের তো উল্লেখযোগ্য জমি নেই, তাহলে কী হারানোর ভয়ে তারা এত আন্দোলনমুখো হচ্ছিল? আমি শ্রীমন দাসকে দেখেছি, যিনি একজন সাঁওতাল, তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাঁর মা আছেন। ছোট্ট একটা ঘর। বাবলু রায়েরও তা-ই। আল আমিন, সালেকীন–সবার বাড়িঘরই দেখেছি এ রকমই। প্রদীপের কোনো জমিজমা নেই। ভিটেমাটি আছে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল : 'আমি আমার এলাকায় খুব ভালো আছি।' কিছু জমিজমা না থেকে, সহায়-সম্বল না থেকে কী করে ভালো আছেন প্রদীপ? কারণ হলো, 'আমার ছোট ভিটায় সব ধরনের গাছ আছে। আমার শাকসবজি আছে। একটা গরু আছে। এটা থেকে দুধ খাই। আমি দুধ বাজারে বিক্রি করি না। আমার মেয়ে কলেজে পড়ে। সকালবেলা টিউশনি করে।' টিউশনি করে কত টাকা পায় জিজ্ঞেস করলে বলে, 'সারা মাসে এক শ থেকে দুই শ টাকা।' এটা দিয়ে মেয়ে কাগজপত্র-কলম কেনার পয়সা জোগায়। আর মেয়েটা সকালবেলা কিছু খেয়ে না খেয়ে কলেজে যায়। যেহেতু সে পড়াশোনায় ভালো, সেহেতু কলেজের টিচাররা তাকে পয়সা ছাড়াই পড়ায়। মেয়ের নাম শংকরী। আর তার ভাই দোকান দিয়ে কোনোভাবে চলছে। তাকে যদি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহলে দেবে তার ভিটেমাটির জন্য। তা-ও যদি দেয়। ঐ ভিটেমাটির ওপর ভর করে শুধু সে টিকে থাকতে পারবে না, সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এসব মানুষ টিকে থাকে তাদের চারপাশের মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে, এই পুরো জগতের ওপর। এই জগৎটা তৈরি হবে কিভাবে? এটার কি ক্ষতিপূরণ আছে?

প্রকৃতপক্ষে এসব মানুষ টিকে থাকে তাদের চারপাশের মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে, এই পুরো জগতের ওপর। এই জগৎটা তৈরি হবে কিভাবে? এটার কি ক্ষতিপূরণ আছে?

কোম্পানি আরো ভেবেছিল, ঐ অঞ্চলে যেহেতু ৬৭টির মতো গ্রামে সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস, সুতরাং তাদের উচ্ছেদ করতে কোনো অসুবিধা হবে না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরাও তা মেনে নেবে। তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আদিবাসী বাঙালিদের দৃঢ় ঐক্য ভাঙা সম্ভব হয়নি।

যা হোক, এর আগে প্রচার ছিল কোম্পানির দালালরা খনির পক্ষে মিছিল বের করবে এবং একটা সংঘাতময় অবস্থা তৈরি করবে। কিন্তু দালালদের সেদিন কোথাও দেখা গেল না। মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। প্রস্তুতি সভায় একজন ক্ষেতমজুর বলছিলেন, তাঁর এলাকায় দালালরা খুবই উৎপাত করছে। সেদিনও যদি বাধা দেয়, তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে কি শাদ করে দেব?' আমরা বহু কষ্টে তাঁকে নিরস্ত করি।

২৬ তারিখ সকাল থেকেই পুরো এলাকায় আরো পুলিশ-র‍্যাব মোতায়েন, সাথে বিডিআরও যোগ দিয়েছে। ফুলবাড়ীতেই বিডিআর ক্যাম্প আছে, সেখান থেকেই বাহিনী নামানো হয়েছে। দোকানপাট বন্ধ। পুরো অঞ্চলের মানুষ তখন আর কোনো কাজে আগ্রহী নয়। শহীদুল্লাহ ভাইসহ জাতীয় কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পৌঁছেছেন সকালের মধ্যেই। জাতীয় কমিটির সভা বসল সকাল ১০টায়। পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ নিয়ে এর আগের দুদিন ধরে আমি নিজে খুবই চিন্তা করছিলাম। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, জনগণ খুব দ্রুত এর নিষ্পত্তি চায়, এর জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত, যেকোনো আক্রমণ হামলা নির্যাতন মোকাবিলা করতেও তারা রাজি। আসলে জনগণ যখন সাংগঠনিক সাধ্য থেকে এগিয়ে থাকে, তখন কর্মসূচি দেওয়া যে কত কঠিন তা নিজেই উপলব্ধি করছিলাম। যা হোক, দুই দিনে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, ফুলবাড়ী নেতৃবৃন্দের পরামর্শ এবং সব শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মসূচি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দিনাজপুর ও ফুলবাড়ীর সাংবাদিকরাও তখন জড়ো হয়েছেন। পুরো আন্দোলন ও কর্মসূচি নিয়ে তাঁদের সঙ্গেও কথা হলো। পরিস্থিতির মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল। খবর আসছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে। মিছিল আসছে, ১২টার দিক থেকে কোথাও কোথাও পুলিশ-র‍্যাবের বাধার খবর আসছিল। আমাদের সিদ্ধান্ত, যেখানে বাধা সেখানেই সমাবেশ করতে হবে। মূল কর্মসূচি কোনোভাবে বিপর্যস্ত করা যাবে না। কোনো কোনো মিছিল বাধা অতিক্রম করে আসতে পারল, কোনো কোনোটি সেখানেই সমাবেশ শুরু করল।

আগে সিদ্ধান্ত ছিল, সুজাপুর স্কুল মাঠে জমায়েত হয়ে মিছিল এশিয়া এনার্জির অফিসমুখো যাবে। কিন্তু ফুলবাড়ী নেতৃবৃন্দ যখন পুলিশের ভাবসাবে এই ধারণা পেলেন যে সেখানে সমাবেশ হলে প্রথমেই তা ঘিরে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হবে, তখন শেষ মুহূর্তে সমাবেশস্থল সরিয়ে ঢাকা মোড়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত দিলেন তাঁরা। পাশেই জে এম স্কুল মাঠও সমাবেশের কাজে লাগানো হবে। ১২টার একটু পর আমরা নিমতলা থেকে হাঁটা শুরু করলাম, দ্রুত তা বিশাল মিছিলে পরিণত হলো। ঢাকা মোড়ে আসতে আসতে আরো নানা মিছিল যোগ দিতে থাকল, যেদিকে তাকাই শুধু মানুষ–নারী-পুরুষ, বাঙালি-আদিবাসী। আদিবাসীদের মাদল বাজছে। বাঁশ, তীর-ধনুকও সাথে। গান, স্লোগান আর বাদ্যে–সব একাকার। ট্রাকের ওপর সাজানো হয়েছে অস্থায়ী মঞ্চ, মাইকে স্লোগান ও ঘোষণা দিচ্ছেন নজরুল ইসলাম ও জোনায়েদ সাকি। আছে গানের দল বিবর্তন, সমগীত, গণসংস্কৃতি ফ্রন্টসহ কয়েকজন শিল্পী। যা হোক, ট্রাকের ওপর আরো আছেন প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা– টিপু বিশ্বাস, বিমল বিশ্বাস, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বদিউজ্জামান, মোসাদ্দেক লাবুসহ আরো অনেকে। পাশেই আছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ, ড. আকমল হোসেন, ড. শামসুল আলম, হায়দার আকবর

খান রনো, এস এম এ খালেক প্রমুখ। সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ফুলবাড়ী নেতৃবৃন্দ–সৈয়দ সাইফুল ইসলাম জুয়েল, আমিনুল ইসলাম বাবলু, হামিদুল হক, আবদুল মজিদ চৌধুরী, জয়প্রকাশ, এস এম নূরুজ্জামান কাজ করছেন। সঞ্জিতপ্রসাদ জিতুর নেতৃত্বে ছিলো স্বেচ্ছাসেবক দল। এছাড়া শিকদার, বকুল, কাইউম, আমিনুল, সানিসহ তরুণ নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন বিষয় তদারক করছিলেন।

গরম ছিল সেদিন বেশ। দুশ্চিন্তা ছিল গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসা এত মানুষ, নানা বয়সের; এই গরমে তাদের পানিপানের জরুরি দরকার হতে পারে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে–এসবের জন্য ব্যবস্থা ছিল, তবু। গরমকে পরাজিত করেছিল অগণিত মানুষের উত্তাপ। আমরা যখন নিমতলা মোড়ের কাছাকাছি, তখনো ঢাকা মোড় থেকে মানুষের মিছিল শেষ হয়নি, অনেক অঞ্চল থেকে তখনো মানুষ আসছে। পথে প্রথম উত্তেজনা তৈরি হলো এশিয়া এনার্জি তথ্যকেন্দ্র নামের সাইনবোর্ড লাগানো ছোট একটি দোকানঘর পার হওয়ার সময়। এই কেন্দ্রের কথা বলেই কোম্পানি দুনিয়ার কাছে দাবি করত, তারা জনগণের কাছে সবকিছু উন্মুক্ত করে রেখেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা সামাল দিয়ে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হলেন। আমরা নিমতলা মোড়ের কাছে পৌঁছার আগেই হঠাৎ একের পর এক টিয়ার গ্যাস শেল। ঘটনার আকস্মিকতায় সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলো। আমরা ট্রাক থেকে নেমে আবার ব্যানার নিয়ে দাঁড়াতেই শৃঙ্খলা ফিরে এলো। ৭০-৮০ হাজার মানুষের মিছিল নিয়ে আমরা আবার রওনা হলাম এশিয়া এনার্জির অফিসের দিকে। একটু পরই ছোট যমুনা নদী। তার ওপর সড়ক সেতু। ঢাকা মোড় থেকে এশিয়া এনার্জির অফিসের দূরত্ব তিন কিলোমিটারের মতো। এশিয়া এনার্জি অফিসের আধা কিলোমিটার আগে ছোট যমুনা নদী। সেতুর এপারে পুলিশ ও বিডিআরের ব্যারিকেড। ব্যারিকেডের সামনে পুলিশ ও জনপ্রশাসনের জেলা নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে কথা বলেন। একপর্যায়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানান যে এশিয়া এনার্জি এখান থেকে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন, তবে প্রকল্পের বিষয়ে কিছু বলার কোনো এখতিয়ার তাঁদের নেই। এখানেই ভ্যানের ওপর দাঁড়িয়ে বিশাল জনসমুদ্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা ও কর্মসূচির সারকথা নিয়ে বক্তব্য রাখি। লিখিত বক্তব্যে ছিল এ রকম :

'...সমগ্র জনগণের রায় ঘোষণা করে বলতে চাই, আমরা মানুষ পরিবেশ জীবন জীবিকা ধ্বংস করে কয়লাখনি চাই না। লুণ্ঠন ও পাচারের জন্য আমরা আমাদের এক ইঞ্চি জমিও দেব না। তাই অবিলম্বে ধ্বংস ও লুণ্ঠনের ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প বাতিল করতে হবে। এই বিশাল সমাবেশ থেকে জনগণের রায় :

১. আজ থেকে এশিয়া এনার্জিকে এই অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো। ফুলবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী সব অঞ্চলে এশিয়া এনার্জির সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে একঘরে করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো।

* তাদের কাছে কোনো দোকান রেস্তোরাঁ কোনো দ্রব্য বিক্রি করবে না।

* তাদের কোনো এলাকায় কাজ করতে দেওয়া হবে না।

২. দেশ ও মানুষের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সর্বনাশ করে যারা এশিয়া এনার্জির দালালি করছে, যারা এশিয়া এনার্জির ঠিকাদার, তাদের সহযোগী–আজকের সমাবেশ থেকে তাদের আহ্বান জানাচ্ছি, আজ থেকে এসব দালালি ত্যাগ করুন।

৩. আজকের এই ঘেরাও কর্মসূচির সুস্পষ্ট ঘোষণা–

ক. আগামীকাল সকালের মধ্যে (পরে বলা হয়, আজ বিকেলের মধ্যে) এশিয়া এনার্জিকে ফুলবাড়ী ত্যাগ করতে হবে এবং তারপর পাততাড়ি গুটিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে।

খ. এর মধ্যে দেশ ত্যাগ না করলে এশিয়া এনার্জির দেশ ছাড়ার দাবিতে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ বুধবার ফুলবাড়ী থানায় অর্ধদিবস এবং বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হবে।

গ. অবিলম্বে দেশ না ছাড়লে অক্টোবর মাসে অবরোধ, এশিয়া এনার্জির অফিস তালাবদ্ধসহ আরো কঠোর কর্মসূচি নেওয়া হবে।'

পুলিশ-বিডিআরের ব্যারিকেডের সামনে ভ্যানসহ উঁচু জায়গায় অস্থায়ী মঞ্চে জাতীয় কমিটি ও স্থানীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ছিলেন। ওপরে বর্ণিত ঘোষণায় জনসমুদ্র সমর্থন জানায়, আর প্রশাসনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ও আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান দিয়ে শহীদুল্লাহ ভাই সমাপনী ঘোষণা করেন। এরপর বিশাল জমায়েত আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকে। আমি, শহীদুল্লাহ ভাই, লাবু, বাবলু, জুয়েল এবং অন্য নেতৃবৃন্দ ভ্যান থেকে নেমে কিছুটা হাঁটতেই একটা ছোট্ট জমায়েত আবারও আমার বক্তব্য শুনতে চাইল, দূর থেকে তারা শোনেনি। হ্যান্ড মাইক নিয়ে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি। ব্যারিকেডের সামনে তখন কয়েক শ মানুষ মাত্র। সে

'বিডিআর-পুলিশ যেতে দিচ্ছে না।' তখন গুলিবিদ্ধ কিশোরকে কোলে নেওয়া যুবক বলছেন, 'যেতে দেবে না কী হইছে? গুলি করবে? কয়জনাক মারবে?'

সময়ই একের পর এক গুলি শুরু হলো। তার দু-তিন মিনিটের মাথায় গুলিবর্ষণ করা হয় সেতুর ওপর থেকে। ওখানে তখন কোনো জমায়েত ছিল না, যে দেড়-দু শ মানুষ ছিল, কেউ কেউ তাদের ফেরত আনতে চেষ্টা করছে, তারা আবার দাঁড়াতে চেষ্টা করছে–এ রকম। কিশোর বয়সীরাই বেশি। কোনোভাবেই সেখানে গুলিবর্ষণের অবস্থা ছিল না। গুলিবিদ্ধ হলো ২০ জন, আহত দুই শতাধিক।

জায়ীদ আজিজ, ফারজানা ববি ও ফারুক ওয়াসিফ তখন ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে সারাক্ষণই কর্মসূচির সাথে ছিলেন। অনেক মুহূর্ত তাই তাঁরা ধরে রাখতে পেরেছেন। গুলির সময় তাঁরা ছিলেন ব্রীজের নীচে। তাঁদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, গুলিবিদ্ধ একজন কিশোরকে নিয়ে কয়েকজন ছুটে যাচ্ছেন, কেউ একজন বললেন, 'বিডিআর-পুলিশ যেতে দিচ্ছে না।' তখন গুলিবিদ্ধ কিশোরকে কোলে নেওয়া যুবক বলছেন, 'যেতে দেবে না কী হইছে? গুলি করবে? কয়জনাক মারবে?'[১২]

পরে নিহত ও আহতদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। নিহত সবাই তরুণ ও কিশোর: তরিকুল, আমিন ও সালেকিন। আহতদের মধ্যে চিরতরে পঙ্গু হয়ে পড়েন বাবলু রায়। গুরুতর আহত হন প্রদীপ ও শ্রীমন বাস্কে। নিখোঁজ থাকার পর খোঁজ পাওয়া যায় জখম আকছার সহ ৬ জনের। এছাড়া আহতদের মধ্যে ফুলবাড়ী, বিরামপুর, পার্বতীপুর ও নবাবগঞ্জ থানার মোট ২২০ জনের তালিকা পাওয়া যায়।[১৩]

গণঅভ্যুত্থান ও বিজয়

গুলি করার পরপর উন্মত্ত হয়ে গেল পুলিশ-বিডিআর। শহরজুড়ে তারা তান্ডব চালাতে থাকল। এর সঙ্গে যোগ হলো কোম্পানির মাস্তানরা। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অমাদের প্রথমে নিয়ে গেলেন অস্থায়ী

অফিসে, সেখানেও বিডিআর-সন্ত্রাসীরা হামলা চালাবে–এ রকম খবর পেয়ে তাঁরা আমাদের নিয়ে গেলেন ভেতরের গ্রামে। সেখান থেকে পার্বতীপুর। এই পথে চলতে চলতেই শহীদুল্লাহ ভাই ও অন্যদের সাথে সামনাসামনি ও মোবাইলে কথা বলে পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক হলো। ইতিমধ্যে মসজিদের মাইকে ফুলবাড়ীতে অনির্দিষ্টকালের হরতালের ঘোষণা হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া তখন মোবাইলে যোগাযোগ করছে। তাদের সকলকে বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা দিনের ঘটনাবলি ও আমাদের কর্মসূচির কথা বলতে হলো। পরবর্তী কর্মসূচির মধ্যে ছিল : ফুলবাড়ীতে অনির্দিষ্টকাল হরতাল, পরদিন অর্থাৎ ২৭ তারিখ ঢাকাসহ সারা দেশে প্রতিবাদ সমাবেশ এবং সেই দিনই ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা।

২৭ তারিখ ঢাকাসহ বিভিন্নস্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। এদিনই ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে আমরা ২৮ তারিখ সারাদেশে ও ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল পর্যায়ের মানুষকে আহ্বান জানাই, সেইসাথে দাবি না মানা হলে ৩০ তারিখ দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করি। ২৬ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত মিডিয়া ফুলবাড়ী নিয়ে নীরব ছিলো। মানুষ জীবন দিয়ে তাঁদের মাথা ঘোরালেন।

হামলা নির্যাতন অব্যাহত থাকার মুখে ২৭ তারিখ সকালে প্রতিরোধের নতুন পর্ব শুরু হয়। জনগণের পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হয়। আক্রান্ত মেয়েরা ঘরের বাইরে হাজারে হাজারে সমবেত হন, ক্রমে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা বলেন, 'আমরা বঁটি দিয়ে কি সারা জীবন পেঁয়াজ আর আলু কাটব? দরকার পড়লে যারা আমাদের জীবন ধ্বংস করতে আইসবে সেই দুশমনদেরও কাটব।' ঘরে ঘরে বিডিআর-পুলিশের আক্রমণের মুখে মেয়েরা রাস্তার মিছিলে ক্রমবর্ধমান হারে যোগ দিতে থাকে। ক্রমে মিছিল বাড়তে থাকে। জুয়েল, বাবলু, জামান, মজিদসহ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন মিছিলের সামনে। ব্যবসায়ী সমিতির নেতা মানিক সরকার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দও তখন সক্রিয়ভাবে রাজপথে। ঢাকা থেকেও নেতৃবৃন্দ যান। ফুলবাড়ীসহ আশপাশের এলাকা জনগণের নিয়ন্ত্রণে, অভূতপূর্ব হরতাল চার থানাজুড়ে। প্রশাসন এরপর অনেক ধরপাকড়, মারপিট করা সত্ত্বেও ফুলবাড়ীর নিয়ন্ত্রণ আর নিতে পারেনি। গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয় পুরো অঞ্চল। চার থানার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বহুদিনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ১০/১২/১৫ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে ফুলবাড়ীতে এসে হাজির হয় আশপাশের থানার হাজার হাজার নারী-পুরুষ। মসজিদের ইমাম সাহেবরা গায়েবানা জানাজাকে পরিণত করেন বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশে। তাঁদের মাইক দিয়েই আন্দোলনের কর্মসূচি প্রচার করতে থাকেন।

সারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদেরও তত দিনে ঘুম থেকে টেনে তুলেছে ফুলবাড়ীর আন্দোলন। জনগণের অসাধারণ ঐক্য, সংহতি আর প্রতিরোধের সামনে পরাজিত হয়ে ২৭ ও ২৮ তারিখ গভীর রাতে এশিয়া এনার্জির লোকজন পুলিশ প্রহরায় এলাকা ছাড়ে। সরকারও অবশেষে মাথা নত করে। ২৮ তারিখ থেকে আলোচনার প্রস্তাব আসা শুরু হয়। সরকারের দিক থেকে প্রস্তাব ছিল দিনাজপুরে গিয়ে তাদের সাথে আলোচনায় বসার, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের কথা ছিল, আলোচনায় আমরা বসতে পারি তবে প্রথমত, দাবি মানার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের উপযুক্ত প্রতিনিধিদল আসতে হবে। দ্বিতীয়ত, আলোচনা হতে হবে ফুলবাড়ীতে বা প্রকল্প এলাকার মধ্যে কোনো স্থানে।

প্রতিদিন সকাল-বিকাল সমাবেশ-মিছিল হচ্ছে তখন চার থানাসহ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। পুরো অঞ্চল তখন জনগণের দখলে। ৩০ তারিখ সরকারি পক্ষ পার্বতীপুর সদরে আলোচনায় বসতে সম্মত হলো। সেদিন সারা দেশে জাতীয় কমিটি আহূত হরতাল চলছে। ৩০ তারিখ সকালে নিমতলা মোড়ে নারী-পুরুষের বিশাল সমাবেশে সরকারের প্রস্তাবের কথা জানানো হলো। দাবির বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না–এই শর্তে সমাবেশ আমাদের আলোচনায় বসতে অনুমতি দিল। দুপুরের পর ফুলবাড়ীর নেতৃবৃন্দসহ আমরা গেলাম পার্বতীপুর থানা গেস্টহাউজে। সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে উপস্থিত হলেন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন রাজশাহীর মেয়র, ভূমি উপমন্ত্রী, দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপারসহ বিভাগ ও জেলার কর্মকর্তারা। আমাদের দাবিগুলো সেখানে বিস্তারিত পড়ে শোনানো হলো। এ বিষয়ে ফুলবাড়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করলেন জুয়েল, বাবলু, জামানসহ আরো অনেকে। আমরা স্পষ্টই জানালাম, আমাদের সাত দফা দাবিনামা থেকে একবিন্দুও আমরা সরব না। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর সরকারি পক্ষ সব দাবি মেনে নিতে রাজি হলো এবং দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। সরকারি দলের মহাসচিবের সাথেও টেলিফোনে কথা বললাম, তিনিও নিশ্চিত করলেন, এই প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবেই এসেছে এবং তাদের চুক্তি অবশ্যই মানা হবে। এরপর সরকারি পক্ষসহ আমরা ফুলবাড়ী গেলাম। অপেক্ষমাণ জনতার সামনে তখন সেখানে সরকারি প্রতিনিধিরা চুক্তির মূল দফা এশিয়া এনার্জি প্রত্যাহার ও ফুলবাড়ী প্রকল্প বাতিলসহ অন্যান্য দাবি মেনে নেবার অঙ্গীকার ঘোষণা দিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করলাম। তবে সাথে এটাও বললাম যে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত জনগণ জেগে থাকবে এবং যেকোনো চক্রান্ত হলে তা মোকাবিলা করবে।

৩০ আগস্ট স্বাক্ষরিত চুক্তি

এতে সরকারের স্পষ্ট অঙ্গীকার ছিল নিম্নরূপ :

'তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী শাখা কর্তৃক উত্থাপিত ৭ (সাত) দফা দাবি নিম্নোক্তভাবে বাস্তবায়ন করা হবে–

(ক) এশিয়া এনার্জির সাথে সকল চুক্তি বাতিল করে এশিয়া এনার্জিকে ফুলবাড়ীসহ ৪ থানা ও বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করা হবে। ফুলবাড়ীসহ ৪ থানা ও বাংলাদেশের কোন জায়গায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি করা হবে না। অন্য কোন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করতে হলে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে করতে হবে।

(খ) ২৬ আগস্ট ২০০৬ ইং তারিখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

(গ) আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং দোকানপাট, হোটেল-রেঁস্তোরা, রিকশা, ভ্যান, মাইক, বাড়িঘর ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে ৯,০০,০০০.০০ (নয় লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর; সহকারী পুলিশ সুপার, ফুলবাড়ী সার্কেল; সিভিল সার্জনের একজন প্রতিনিধি এবং তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী শাখার দুইজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ নিরূপণপূর্বক ক্ষতিপূরণ দেয়া

হবে।
(ঘ) ২৬ আগস্টের ঘটনায় গুলিতে নিহতদের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
(ঙ) একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, একজন সহকারী পুলিশ সুপার ও তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ফুলবাড়ী শাখার দুইজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে হত্যা করে গুম করা লাশ উদ্ধার বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
(চ) নিহতদের নামে ফুলবাড়ী নতুন ব্রিজের পাশে উপযুক্ত স্থানে সরকারি উদ্যোগে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে।
(ছ) এশিয়া এনার্জির চিহ্নিত দালালদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। কয়লাখনি বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দের নামে দায়েরকৃত মামলা-জিডি প্রত্যাহার করা হবে এবং এ বিষয়ে নতুন কোন মামলায় নেতৃবৃন্দকে জড়ানো হবে না।'

ফুলবাড়ী প্রতিরোধের প্রাণ

গুলি করে মানুষ মেরে মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে প্রতিরোধ আন্দোলন পণ্ড করতে চেয়েছিল এশিয়া এনার্জি ও তার পৃষ্ঠপোষকরা। হত্যাকাণ্ডের পরও তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হয়েছে জ্বালানি উপদেষ্টাসহ দালালদের সাহসে। কিন্তু মানুষ তখন অপ্রতিরোধ্য। আগেই বলেছি, ফুলবাড়ী প্রতিরোধ জনগণের মধ্যে অসাধারণ ঐক্য ও সংহতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মের দিক থেকে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান; জাতির দিক থেকে বাঙালি, সাঁওতাল, ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী; লিঙ্গের ভিত্তিতে নারী-পুরুষ এবং বয়সের দিক থেকে শিশু, কিশোর, যুব, বৃদ্ধ–সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছে এই আন্দোলনে। এবং পরের ১০ বছরে অনেক ওঠানামা থাকলেও এই প্রতিরোধ চেতনায় ছেদ পড়েনি। সেজন্যই বারবার পরাজিত হয়েছে চক্রান্তকারীরা।

গণ-অভ্যুত্থান যাঁদের রক্তের ওপর নির্মিত হয়েছে, যাঁদের রক্তে আমাদের দায়, ১০ বছর ধরে তার শক্তিই আমাদের চালিত করেছে, এখনো করছে। ২০০৬ সালে এই সহযোদ্ধাদের যেভাবে দেখেছি, তার কয়েকটি চিত্র দিয়ে প্রতিরোধের এক দশকের মধ্যে প্রথম বছরের আংশিক কাহিনি আপাতত এখানেই শেষ করি।

১. "বাবলু এখনো শুয়ে আছে পিজি হাসপাতালে। ওর উঠে বসার শক্তি নেই। মেরুদণ্ডে আর পেটে গুলি লেগেছিল। কোমর থেকে নিচে বাকি শরীর পুরোটাই অবশ। ওর শরীরে পাটাই ছিল ওর উপার্জনের উৎস, ও ভ্যান চালাত। শরীরের অর্ধেক যখন অবশ, তখনো ওর মনে কোনো অবসাদ আসেনি। অনেক যোগাযোগ করে বাবলু যখন মোবাইলে ওর দুই শিশুপুত্র, বউ আর মায়ের সাথে কথা বলছিল, তখনো ওর গলা ভেঙে আসেনি, সান্ত্বনা দিতে দিতে বলে, 'দেখিস, আর কখনো এশিয়া এনার্জি আসতে পারবে না। দেখিস, এক মুখে বলছি।' ওর সাথে থাকা মামা ফোনে বাবলুর বউ আর নানির সাথে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে আকুল হচ্ছিলেন, 'মা, মা রে, ভালো হয়ে যাচ্ছে মা, ভাগ্নে আমার দেশের স্বাধীনতার জন্যি লড়াই করেছে মা'।"

২. "প্রদীপ অনেক দিনই অচেতন ছিলেন ঢাকার হাসপাতালে। তাঁর হাত আর পেট চিরে গুলি বের হয়ে গিয়েছিল। অচেতন অবস্থায়ই আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। তাঁর বোন ছায়া ছায়ার মতোই লেগে ছিলেন একটানা। একদিন ছায়া বললেন, 'এখন মনে হয় অবস্থা একটু ভালো।' কী করে বুঝলেন? 'বুঝলাম, মানে দাদা আমাকে বকা দিচ্ছে তো।' ঘোরের মধ্যেই প্রদীপ কথা বলছিলেন তখন। এ রকম একদিন আমি যখন তাঁর সামনে, তিনি একবার চোখ খুললেন, আমার হাতটা ধরলেন, বললেন, বাবু...আবার ঘুমে, হাতটা ধরাই থাকল। আবার যেন জেগে উঠে ঘোরের মধ্যেই বললেন, 'বাবু...যে ইজ্জত দিতে জানে, সে জীবনও দিতে জানে।' কথাটার অর্থ কী? কথাটার ছন্দ এমন, এমন তার ওজন যে সারাক্ষণই তা মাথায় ঘুরতে থাকে। ইজ্জত আর জীবন একাকার, ইজ্জত কাকে? জীবন কাকে? নিজেকে, নিজের স্বজনদের, নিজের ভূমিকে? যদি নিজেকেও ইজ্জত দিতে হয় তাহলেও জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই কি?"

৩. "পার্বতীপুর রাস্তা থেকে অনেক ভেতরে যেতে হয় সালেকীনের বাড়িতে যেতে। চারদিকে সবুজ আর সবুজ, তার মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। গ্রামের মানুষ জানাল, এই রাস্তায় এশিয়া এনার্জি সুরকি ফেলেছিল নিজেদের গাড়ি চলাচলের সুবিধা করার জন্য। এই রাস্তায় বেশ কয়েকটি স্পট আছে তাদের, সেগুলো এখন আর আস্ত নেই। সালেকীনের বাড়ি মাটির। আগের দিন স্কুলের পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল ও। ওর মায়ের বিলাপ এখনো শেষ হয়নি। মায়ের বিলাপ শেষ হয় কিভাবে? হাত ধরে বিলাপে বিলাপে বলেন, 'বাবা রে, মুই ভুলতে পারি না গো।' একই রকম কথা আল আমিনের মায়ের কান্নার মধ্যেও। আশপাশে নারী-পুরষ অনেক। পানি অনেকেরই চোখে, কিন্তু শুধু শোকের ভাব নেই। তাই একজন যখন বলেন, 'দুশমনেরা মায়ের বুক খালি কর‍্যা নিল কোম্পানির জন্যি?' তখন সবার মধ্যে যেন সাড়া পড়ে যায়।

সন্তান কেন মিছিলে গেল সেই আক্ষেপ শুনিনি কোথাও, ক্রোধ দেখেছি বিডিআর আর এশিয়া এনার্জির প্রতি। রিকশা-ভ্যান শ্রমিক সমিতি আর দোকান কর্মচারী সমিতি বিডিআর সদস্যদের জন্য অনির্দিষ্টকালের বয়কট ঘোষণা করেছে। কেউ তাদের কাছে কিছু খরচ (বিক্রি) করবে না, কেউ তাদের পরিবহনে তুলবে না। শ্রীমন বাস্কে গুলির যন্ত্রণা নিয়ে, গুলজার রাইফেলের আঘাতে পঙ্গু হয়ে এখনো হাসপাতালে। আরো অনেকে ঘরে ঘরে পায়ে, হাতে, মাথায়–এমনকি চোখে গুলি বা আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তার পরও মনের

জনগণের পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হয়। আক্রান্ত মেয়েরা ঘরের বাইরে হাজারে হাজারে সমবেত হন, ক্রমে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা বলেন, 'আমরা বটি দিয়ে কি সারা জীবন পেঁয়াজ আর আলু কাটব? দরকার পড়লে যারা আমাদের জীবন ধ্বংস করতে আইসবে সেই দুশমনদেরও কাটব।' ঘরে ঘরে বিডিআর-পুলিশের আক্রমণের মুখে মেয়েরা রাস্তার মিছিলে ক্রমবর্ধমান হারে যোগ দিতে থাকে। ক্রমে মিছিল বাড়তে থাকে।

জোর কমেনি। এই মানুষেরা সরল। কিন্তু যা কিছু করেন, বুকের ভেতর থেকে করেন। বললেন তাই একজন, 'বুকের মধ্যে নিয়ে নিছি। আমাদের এক ইঞ্চি ভূমি কোম্পানিকে দেব না।' পায়ে গুলি লেগেছে এ রকম এক তরুণ চুটকা এক পায়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলে, 'এরপর বুকে গুলি নেব, দেখবে তুমরা'।"[১৪]

৪. ওর নাম মাজেদা। ২৭ তারিখ পুরো এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছিলো পুলিশ ও বিডিআর, ঘরে ঘরে তল্লাশী পাইকারি নির্যাতন চালাচ্ছিলো, তখন ক্ষোভ দানা বাঁধছিলো কিন্তু প্রতিরোধ তখনও পাল্টা আঘাত শুরু করেনি। একপর্যায়ে মাজেদার চোখের সামনে যখন বিডিআর ফুলবাড়ী আন্দোলনের একজন সংগঠককে নির্মমভাবে নির্যাতন করছিলো তখন তার পক্ষে আর চুপ থাকা সম্ভব হয়নি। মাজেদা দা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নির্যাতকদের ওপর। বিডিআরও তাকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলো, ততক্ষণে আরও মেয়েরা হাতে যা কিছু আছে তা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাঁধ ভেঙে গেছে পাল্টা প্রতিরোধের। মাজেদা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণ করেছে, আঘাতে মাটিতে পড়ে গেছে, আহত হয়েছে তখন ওর পেটে অনাগত শিশু। ২০০৭ সালের প্রথম দিকে ওর জন্ম হয়েছে। প্রতিরোধের চৈতন্য দিয়ে মাজেদা তার নাম রেখেছে 'আশা'।[১৫]

এই মানুষদের কোন পুঁজি বা অস্ত্রশক্তি পরাজিত করতে পারে? পারে না। পারেনি বলেই সৃষ্টি হয়েছে প্রতিরোধের এক দশক। জনগণের শক্তি নিয়ে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: anujuniv@gmail.com

তথ্যসূত্র ও পাদটিকা:

১) ফুলবাড়ীর কৃষক, ফুলবাড়ীর রক্তপতাকা (জায়ীদ আজিজ ও ফারজানা ববি নির্মিত তথ্যচিত্র)

২) ফুলবাড়ীর কৃষক, হাঁরা কয়লাখুনি চাই না (নাসরিন সিরাজ এ্যানী নির্মিত তথ্যচিত্র)

৩) পরে তাদের করা সমীক্ষা আর পুনর্বাসন পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন স্বাধীন আন্তর্জাতিক খনি বিশেষজ্ঞ রজার মুডি ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ জেনিফার কেলাফাত। অসংগতি, অস্বচ্ছতা আর প্রতারণার দৃষ্টান্ত তাঁরা হাজির করেছেন পাতায় পাতায় (২০০৮)। এর আগে এশিয়া এনার্জি জমাকৃত 'খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা' পরীক্ষা করে মতামত দেওয়ার জন্য সরকার বুয়েটের অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলামকে প্রধান করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। কমিটি তাদের রিপোর্টে এই প্রকল্প অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও আইনগত বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত দেয় (বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট, সেপ্টেম্বর ২০০৬)। পরবর্তী সময়ে পাটোয়ারী কমিটি (২০০৭-০৮) ও মোশাররফ কমিটিও (২০১১-১২) এই প্রকল্পের বিরুদ্ধেই মত দিয়েছে। কিন্তু কোনো সরকারই এ বিষয়ে আর কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। অন্যদিকে নানা রকম গোপন, অস্বচ্ছ ও দুর্নীতিমূলক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

৪) ফুলবাড়ী প্রকল্পে লাভ ক্ষতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্যসহ আমিনুল ইসলাম বাবলুর একটি লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় জাতীয় গণফ্রন্টের মুখপত্র অনির্বাণ-এ (আগষ্ট ২০০৫)। লেখার শিরোনাম ছিলো: 'ফুলবাড়ী কয়লা সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসুন। সাম্রাজ্যবাদ ও কমিশনভোগী দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে জাতীয় সম্পদ রক্ষা করুন।' বাবলু পরে বিপুল ভোটে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, তিনি বর্তমানে জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা। মোশাররফ হোসেন নান্নু বর্তমানে কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক।

৫) এই লেখাটি পরে আমার *উন্নয়নের রাজনীতি* শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৬। সূচীপত্র, ঢাকা।

৬) এসব কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন বিপ্লব দাস : *ফুলবাড়ী কয়লাখনি ও বহুজাতিকের স্বপ্নভঙ্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৯।

৭) GOB: Energy and Mineral Resources Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Bangladesh Coal Policy, Version 2, 23 January 2006. Prepared by Infrastructure Investment Facilitation Center, Dhaka Bangladesh.

৮) কয়লানীতি নিয়ে আরো আলোচনার জন্য দেখুন *ফুলবাড়ী কানসাট গার্মেন্টস ২০০৬* গ্রন্থ (শ্রাবণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। কয়লানীতি কীভাবে রাষ্ট্র ও ব্যবসার আঁতাতের সাক্ষাৎ প্রমাণ দেয় তা নিয়ে মাহা মির্জা এই সংখ্যায় আরেকটি প্রবন্ধে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন।

৯) এ সংক্রান্ত সংবাদপত্রের অনুসন্ধানী রিপোর্টের জন্য দেখুন ডেইলি স্টার ও নিউ এজ, ১৭ জানুয়ারি ২০০৬

১০) সেই জবা রানীর বিয়ে হয় সহযোদ্ধাদের সমর্থনে মুক্ত পরিবেশে, ২০০৭ সালের জুন মাসে। ঘর এখনো ভাঙা। কিন্তু সেই ঘর ছাপিয়ে বিজয় ডালিমা বালা জবা রানী অনেক ওপরে।

১১) এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন, মফিজুর রহমান লাল্টু: 'ফুলবাড়ী আন্দোলনে রাজনীতি ও সংস্কৃতির সম্মিলন', *কাগমারী সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদনা: মহসিন শস্ত্রপাণি, ঢাকা, মে ২০১১।

১২) পরিকল্পিত তথ্যচিত্র এখনো অসমাপ্ত। তবে এর একাংশ *ফুলবাড়ীর রক্তপতাকা* নামে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। আরেকটি সংস্করণ *ফুলবাড়ীর সাতদিন* নামে অসমাপ্ত অবস্থায় কয়েকবার প্রদর্শিত হয়েছে।

১৩) *নয়া দুনিয়া*, ফুলবাড়ী বিশেষ প্রকাশনা, ডিসেম্বর ২০০৬

১৪) সহযোদ্ধাদের নিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতাগুলো লিখেছিলাম ২০০৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। এটি পরে আমার *ফুলবাড়ী কানসাট গার্মেন্টস ২০০৬* গ্রন্থে সংকলিত হয়।
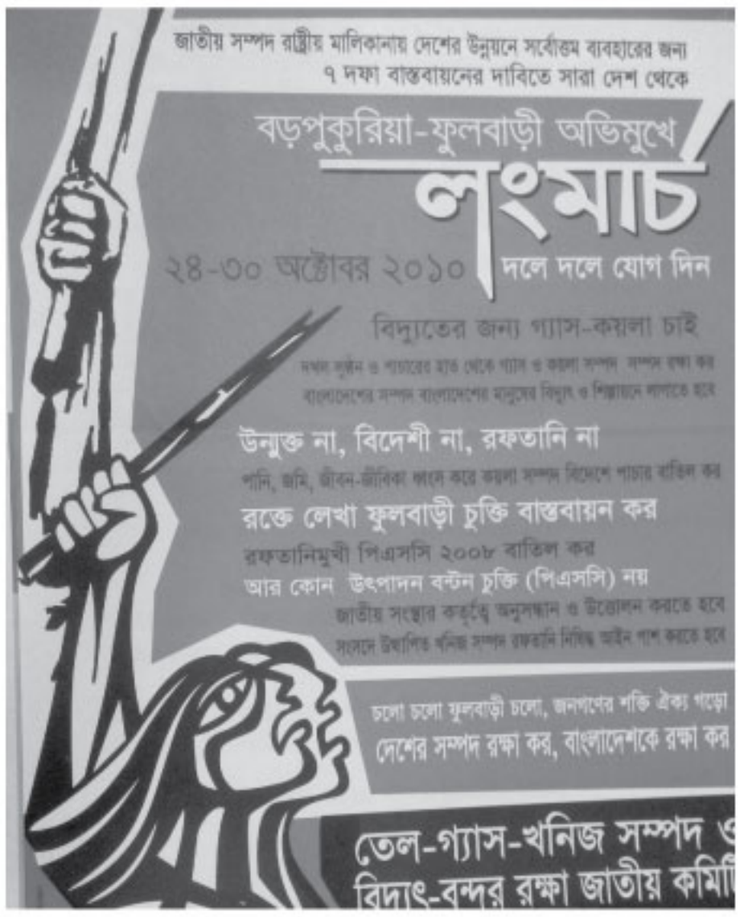
১৫) Nusrat Sabina Chowdhury: *Energy Emergency: Phulbari and Democratic Politics in Bangladesh,* Chicago, ২০১২. অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস।